KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫, মার্কুইস মার্কেট প্লেস, কল-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 5/1 5/4 6/1 6/2	Year of Publication : July 81 Jan - March - April - Jun 82 Oct 82 Oct - Dec 82 , Jan - March 83
	Condition : Brittle / Good
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বভাব

বভাব

১৮

বিশেষ দিলীপকুমার গুপ্ত স্মৃতিপুরস্কার সংখ্যা

বভাব

সম্পাদক/সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া ওঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি—
পৌরুষের করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ. ৫১৬৬

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
গ্রীষ্ম সংখ্যা ১৩৮৯
বিভাব

বিভাব বিশেষ সংখ্যা: "দিলীপকুমার গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার" ক্রোড়পত্র

প্রবন্ধ

প্রকাশকের ভূমিকা। লীলা মজুমদার ১৯
কাজের মানুষ ডি কে। সত্যজিৎ রায় ২৪
ডি. কে. এবং তরুণ কবিরা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৮
প্রমা কাহিনী। সুরজিৎ ঘোষ ৩৪
সত্যিকারের নতুন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৩৮

প্রবন্ধ

গ্রহণ বর্জন পালা। অরুণ মিত্র ১
গ্রহের চক্রান্ত। নিত্যপ্রিয় ঘোষ ৬

ব্যক্তিগত রচনা

কবি নন, তিনি কবিতার জন্য। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৬
আমি জানি না, আপনারা জানেন। সুধীর মুখোপাধ্যায় ৫৩

বিদেশী সাহিত্য: অনুবাদ

অক্টাভিয়ো পাৎস। কমলেশ চক্রবর্তী ১৯
মিরোস্লাভ হোলুবের কবিতা। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪

আলোচনা

কবিতায় সমর্পিত। সমর চক্রবর্তী ৪২

কবিতাগুচ্ছ

সুভাষ ঘোষালের কবিতা। গৌতম গুপ্ত ৪৮

পুরাতনী

ডমরু চরিত। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৬

সম্পাদকীয় ৭৮

সম্পাদকমণ্ডলী

পবিত্র সরকার　　সুবিমল লাহিড়ী
প্রদীপ দাশগুপ্ত　　শচীন দাশ
দেবীপ্রসাদ মজুমদার
সম্পাদকীয় দপ্তর : ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস
কলকাতা-৭০০০১৭

সম্পাদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ : শঙ্কর ঘোষ / অনুপ রায়
অলংকরণ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়
কভার মুদ্রণ : দি র‍্যাডিয়্যান্ট্ প্রসেস্

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৭ থেকে
প্রকাশিত এবং করুণা প্রিন্টার্স, ১৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা-৪
ও তারকনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ১২ বিনোদ সাহা লেন
কলকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

বিভাব

দিলীপকুমার গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার সংখ্যা

দ্বিতীয় বর্ষ

জুলাই : ১৯৮২

বিশেষ ক্রোড়পত্র

লিটল ম্যাগাজিন পড়ুন

প্রকাশকের ভূমিকা

লীলা মজুমদার

পত্রিকার নাম 'বিভাব'। সাহিত্য-পত্র। দেশবিদেশে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে নানান সাহিত্য-পত্রের প্রভাব দেখতে পাই। এমন কি পত্রিকা হয়তো স্বল্পেক বছর পরে উঠে গেলো, কিন্তু দেশের সাহিত্যের ওপর চিরকালের মতো একটা ছাপ রেখে গেলো। বাংলাতেও বহু বার সে-রকম দেখা গেছে। যেমন 'বঙ্গদর্শন' 'সবুজপত্র' 'কল্লোল' 'কবিতা' ইত্যাদি। 'বিভাবে'র প্রভাব কতদূর বিস্তৃত হবে এ-কথা না জেনেও বলা চলে 'বিভাব' একটি সাহিত্য-পত্র এবং আত্ম-সচেতন সাহিত্য-পত্র। তা না হ'লে আজকাল চলে না।

চলন্তিকায় 'বিভাব' শব্দের মানে দেওয়া আছে—যে-বিষয়ের সন্নিবেশহেতু রসের উৎপত্তি হয়, আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন হ'লো সেই সব জিনিস, যাকে অবলম্বন ক'রে রসের অবতারণ হয়। উদ্দীপন হ'লো উত্তেজন, বিবর্তন, প্রজ্বলন, সম্যক্ বৃদ্ধিসাধন। এ-সমস্তই হ'লো আদর্শ প্রকাশকের কর্তব্য। সেই দিক দিয়ে দিলীপকুমার গুপ্তের স্মরণে 'বিভাবে'র এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দিলীপ এখানে ক্ষণ-ভঙ্গুর একটা মানুষ নয়, বরং একটি আদর্শের প্রতীক। সে-আদর্শ আজকের বিভ্রান্তিময় সাহিত্য-ক্ষেত্রে ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

জল থাকে, মাটি থাকে, হাওয়া থাকে, আলো থাকে, নানান খনিজ আর উদ্ভিদপ্রসূত সামগ্রী থাকে, জীব-জন্তু থাকে—কিন্তু কে সে-সব দিয়ে রূপ গ'ড়ে তোলে, শিল্পী যদি না-ই এলো? বই প্রকাশের বেলাতেও ঠিক তাই। কাগজ তৈরি হলো, কালি শিশিতে ভরা হলো, পাণ্ডুলিপি লেখা হলো, চিত্রকর তার সারঞ্জাম আনলো, ছাপাখানা দরজা খুললো, প্রুফ দেখার লোক চশমা পরলো, দপ্তুরি অপেক্ষা ক'রে থাকলো। কিন্তু বই তৈরি করতে যে জানে সে যদি না আসে, পাণ্ডুলিপিতে মোক্ষম কথা লেখা হলেও বড় জোর বইয়ের গা তৈরি হবে যেমন-তেমন ক'রে, তার উদ্দীপন উত্তেজন বিবর্তন প্রজ্বলন সম্যক্ বৃদ্ধি-সাধন কে করবে?

পৃথিবীতে মানুষের হাতে যত জিনিস তৈরি হয় তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো

বই। কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠত্বের যোগ্য সম্মান দেওয়া খুব সহজ কাজ নয়। আজকের বাংলা সাহিত্যের জগতে সে-রকম একটিও মানুষ দেখি না। সিগনেট প্রেসের হাতেই এক রকম বলতে গেলে সাহিত্যলোকে আমার প্রথম প্রবেশ। তার আগে মাসিক পত্রিকায় লিখেছি অনেক, কিন্তু আমার জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর-প্রতিষ্ঠিত ইউ. রায় এণ্ড সন্স যখন উঠে যায়, তখনো আমি স্কুলের গণ্ডী পার হইনি। প্রকাশক কেমন হয় সে-বিষয়ে কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিলো না।

আমার 'দিন-দুপুরে' ছাপা হ'লো আমার আত্মীয় সত্যজিতের আগ্রহে। সে তখন নানা ভাবে দিলীপের সহকর্মী। পাণ্ডুলিপি দিয়েই আমি নিশ্চিন্ত। বই বেরুলো নিখুঁত। অমন বই আমার আর একটিও হ'লো না। চল্লিশ বছর পরেও দেখি আর অবাক হই। এ-বই যত না আমার, তার চেয়েও বেশি দিলীপের কাজ। 'দিন-দুপুরে' বলতে আমার সেই কাগজের কুচিতে, হৃদয়ের তন্ত্রী নিংড়ে যে-সব মজার কথা বেরিয়েছিল, তার চেহারা মনে হয় না, দিলীপ তাকে যে সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ দিয়েছিলো, তারই কথা মনে হয়।

সেরা জিনিস না হ'লে তার মন উঠতো না। বইকেও হ'তে হবে সেরা জিনিস। তার জন্য কোনো কষ্টকে সে কষ্ট মনে করতো না। তার পাণ্ডুলিপি বাছাই ছিলো অভ্রান্ত; এত বছরের কর্ম-জীবনে একটিও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাণ্ডুলিপি সে গ্রহণ করেনি। বই কেমন বিক্রি হ'লো, সে হ'লো অন্য প্রসঙ্গ। বেশি বিক্রি হ'লেই, এমন-কি বেশি জনপ্রিয় হ'লেই বেশি সমালোচিত হ'লেই, বই ভালো হয়ে যায় না। সিগনেট প্রেসেরও সব বই সমান বিক্রি হ'তো না। কিন্তু কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপিই গৃহীত হ'তো এবং তাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে, সংবাদ-পত্রে জয়জয়ন্তী ক'রে, তার গুণ প্রতিপন্ন করার কোনো চেষ্টাই হ'তো না।

ঐ রকম বই দেখেই আমার অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছিলো; যার বানান অকাট্য, প্রচ্ছদ অতুলনীয়, ছবি অপূর্ব, ছাপাই নির্ভুল, বাঁধাই বলিষ্ঠ, দাম সর্বজননন্দিত। আসলে মানুষটি ছিলো গুণগ্রাহী, অন্য লোকের মধ্যে প্রতিভা সে খুঁজে বেড়াতো। প্রতিভাবানকে অপমান ক'রে ফিরিয়ে দিতো না। ভালোকে ভালো বলার আর মন্দকে মন্দ বলার সৎসাহস তার কাছেই অনেকখানি দেখেছি। নতুন লেখকের লেখা ছাপতো দিলীপ, নতুন লোক দিয়ে ছবি আঁকাতো, কিন্তু কখনো অক্ষম অপটুকে চটকদার মুখোস পরিয়ে দাঁড়

করাতো না। উৎকৃষ্ট লেখা না হ'লে ছুঁতো না। যারা সিগনেট প্রেসের সহযোগিতা পেতো, সাহিত্যজগতে তাদের জন্য একটা জায়গা হ'য়ে যেতো। অথচ দিলীপের ব্যবহারে মুরুব্বিয়ানার নাম গন্ধ ছিলো না। কখনো লেখকের মনে হ'তো না প্রকাশক তার বই ছেপে তাকে কৃতার্থ ক'রে দিয়েছে। বরং কেবলি মনে হ'তো সাহিত্য ও সাহিত্যিককে সে কী চোখেই না দেখে।

চার দিকে চোখ ছিলো তার। অনেক সময় পাণ্ডুলিপির সঙ্গে ছাপা পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠা দিয়েছি। সম্পাদকরা নিজেদের ইচ্ছামতো বানান ছাপতেন। অবিশ্যি তাঁদের দোষী করা হয়তো অন্যায় হ'লো, আমার অনেক সময়ই সন্দেহ হয় বানানের অন্তিম রূপ নির্ধারণ করেন প্রেসের কম্পোজিটর-বাবু। সে যাই হোক, দিলীপের প্রকাশনালয়ে সব লেখা কপি করা হ'তো। বড় বড় খাতায়। অনেক সময়ে নীলিমা দেবীর মুক্তোর মতো হস্তাক্ষরে। সে-লেখা যে দেখেছে প্রশংসায় ও আত্ম-ধিক্কারে সে হতবাক হয়েছে।

দিলীপ চেষ্টা করতো সব পাণ্ডুলিপির বানানকে এক নিয়মে ফেলতে। অবিশ্যি মূল লেখক আপত্তি করলে কি হ'তো জানি না। আমি আপত্তি করিনি কখনো, কিন্তু সেই ইস্তক বানান সম্বন্ধে অতি-সচেতন হ'য়ে গেছি।

কোনো আনাড়ি কাজ পার পেতো না তার কাছে। মলাটগুলো দেখি আর অবাক হই। শুধু অলংকরণই ভালো নয়, কাগজ ভালো; কার্ডবোর্ড ভালো, হিঞ্জ ভালো, স্পাইন্ ভালো, সব ভালো। আমার কাছে বিশ-পঁচিশ বছরের পুরনো, বহুবার পঠিত অনেক বই আছে, আজো তার মলাট আলাদা হ'য়ে যায়নি।

বই তৈরির ব্যাপারে শুধু প্রকাশকের কথা বললেই যথেষ্ট হ'লো না। এই বিশেষ প্রকাশকটিকে হ'তে হ'তো একাধারে সেরা সম্পাদক ও সেরা সমালোচক। নইলে ভালো জিনিস চেনা যাবে কী ক'রে? মানুষের হাতে তৈরি ভালো জিনিসেও খুঁত থাকে। টপ্ ক'রে সেটি ধরতে পারা চাই। একবার ধরলে আর ছাড়ান-ছোড়ান নেই। হয় লেখক নিজে, নয়তো সম্পাদক-প্রকাশক সেটি শুধরে দেবেন। তাই ব'লে লেখকের মৌলিকতায় বা স্বকীয়তায় এতটুকু হস্তক্ষেপ করা নয়। করলে তাঁকে হনন করা হয়।

আসলে এ-সব কাজ একজনের নয়। সমৃদ্ধ দেশে প্রকাশকের কাজ হ'লো নিখুঁতভাবে প্রস্তুত করা পাঠ্যাংশকে যথাসাধ্য সুন্দর ক'রে ছেপে বের করা। রীডাররা প্রেরিত পাণ্ডুলিপি প'ড়ে উপযুক্ত রচনাগুলি নির্বাচন করেন।

সম্পাদকরা লেখকের সহযোগিতায় পাণ্ডুলিপিটিকে নিখুঁত নির্ভুল রূপ দেন বই ছেপে বেরোলেই সমালোচকরা আসেন— অনেক সময় বাজারে বই ছাড়ার আগেই— সম্ভাব্য পাঠক-সম্প্রদায়ের, অর্থাৎ জনসাধারণের— সেখানে সবাই লিখতে পড়তে পারে— সামনে প্রকাশিত বইয়ের ভালো-মন্দ তুলে ধরতে।

সমালোচনার কাজ বড় সহজ নয়। নিজের অহমিকা ও মতামতের প্রতি মমতা ভুলে, সহানুভূতি ও সমবেদনা সহকারে অপরের রচনা বিচার করা বড় শক্ত কাজ। শোনা যায় সমৃদ্ধ দেশে কত সময় বই বেরোবার আগেই তার ভাগ্য নির্ণয় করা হ'য়ে যায়। হয় সমালোচকের প্রসাদে প্রভূত সাফল্য, নয় তাঁর কোপে প'ড়ে সর্বনাশ। সুখের বিষয় আমরা এখনো অতটা অগ্রসর হইনি, যদিও দিনে-দিনে সমালোচকদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে চলেছে।

দিলীপের মন ছিলো অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। কী বলিষ্ঠ সততা ছিলো তার। কোনো নিকৃষ্ট উপায়ে বই বিক্রি করা নয়। ভালো বই নিজের ভালোত্ব দিয়েই বিকোবে। লেখা ভালো, ছাপা ভালো, অঙ্গ-সজ্জা ভালো। এমন বই লোকে নিশ্চয় কিনবে। কিছু বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'তো বৈ-কি, তা তাকে বিজ্ঞাপনই বলা হোক, কি সমালোচনাই বলা লোক। তবে রঙচঙে থলিতে ভ'রে কোনো চটকদার চমৎকৃতির আয়োজন নয়। দিলীপকুমারের 'টুকরো কথা'-য় কী চমৎকার সব বইয়ের মূল্যায়ন হ'তো। নিজের ও পাঁচজন ওয়াকিবহাল পাঠকের মতামত সম্বলিত সব বইয়ের 'টুকরো কথা'-গুলিকে কেন রেখে দিইনি ব'লে আজ আমার আক্ষেপের শেষ নেই। সিগনেট প্রেস যদি তাঁদের ফাইলে সেগুলি রেখে থাকেন, তাই দিয়ে ছোট একটি সুন্দর বই হয়, দিলীপের কর্মজীবনের ছোট একটি স্মারক-লিপি। লোকের চোখ ফোটাবার বই। সাধারণত সমালোচনা প'ড়ে সমালোচকের নিজের জ্ঞান-বিদ্যা, মনোভাব ও মতামত সম্বন্ধে যতখানি জানা যায়, সমালোচিত লেখক বা লেখা সম্বন্ধে তার অর্ধেকও জানা যায় না। নিজেকে বাদ দিয়ে সমালোচনা লেখা বড় শক্ত। তার চাইতে নিজের মতামতগুলো রবীন্দ্রনাথের কিংবা বিদ্যাসাগরের কিংবা বঙ্কিমের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের ওপর আরোপ ক'রে দিলে, তাঁদেরও সত্যিকার কোনো ক্ষতি হয় না, সমালোচকেরও বল বাড়ে। একটি মাত্র অসুবিধা বুঝতে হ'লো হতভাগ্য পাঠক নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে আলোচিত বিষয়টিকে যেটুকু পেরেছিলো, তা-ও সমস্তই ধোঁয়া হ'য়ে যায়। অল্পচেনা জিনিসের যেন এক সম্পূর্ণ অচেনা চেহারা দেখা যায়। অন্য লোকের চশমা প'রে

বহির্জগৎকে দেখবার চেষ্টা করলে যেমন সব-কিছুকে বাঁকা-চোরা, অদ্ভুত, অসত্য দেখায়।

দিলীপের অন্য নিয়ম ছিলো। লেখক কী আশ্চর্য কথা বলেছেন তাই জানাবার চেষ্টা করতো। উদাসীন পাঠক সচকিত হ'য়ে উঠতো, ভীরু লেখকের মনে আত্ম-প্রত্যয় জন্মাতো। সৃজনশীল কাজকে কী শ্রদ্ধাই না করতো দিলীপ। কেউ ভালো কিছু লিখলো বা আঁকলো তো সে আহ্লাদে আটখানা। ফুল নিয়ে, সন্দেশ নিয়ে তার বাড়ি গিয়ে হাজির হ'তো। লেখক যা দিয়েছেন তা মাথায় ক'রে নিতো, আর যা দেবার তাঁর সম্ভাবনা আছে তার স্রোতের মুখ খুলে দেবার চেষ্টা করতো। আমার চেয়ে সে দশ বছরের ছোট ছিলো, তবু কেবলই বলতো—তুমি নিজেই জানো না তোমার মধ্যে কী শক্তি আছে। শুনে রোমাঞ্চিত হতাম। এতটুকু গর্বের খাদ কোথাও থাকলে সে উড়ে পালাতো। সে আমাকে সচেতন সদাজাগ্রত ক'রে রাখতো; যাতে যেটুকু শক্তি আছে, তার অপচয় বা অপব্যবহার না করি।

নানান সাংসারিক আবর্তনে প'ড়ে সে সিগনেট প্রেসের কেন্দ্র থেকে সরে গেছিল। আমার মতো লেখকরা সেই অবধি নিরাশ্রয় হয়েছি। তার মতো মানুষ কটা জন্মায়?

এ বছরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপত্রকে অভিনন্দন জানাচ্ছে

গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা)

১, ২ ও ৩ নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৬৯

কাজের মানুষ ডি কে

সত্যজিৎ রায়

১৯৪৩-এর গোড়ার দিক। কলকাতা শহরে তখন জাপানী বোমার হিড়িক। মাস দুয়েক হ'লো শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে চাকরির চিন্তা করছি। কলাভবনের তালিম সত্ত্বেও ফাইন আর্ট্‌স-এর দিকে মন ঝোঁকেনি। ইচ্ছা আছে বিজ্ঞাপন-শিল্পী হবার, কিন্তু বিজ্ঞাপনের লাইনে কারুর সঙ্গে পরিচয় নেই। কী ভাবে এগোনো যায় সেটাই প্রশ্ন।

আমাদের বাড়ি তখন প্রায়ই আসতেন 'ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড' বৃদ্ধ ললিত মিত্তির। তিনি আমার সমস্যার কথা শুনে বললেন, 'কোনো চিন্তা নাই। কীমার কোম্পানির অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার হইল আমাগো দিলীপ গুপ্ত। তারে আমি খুব চিনি। তমারে তার কাছে লইয়া যামু।'

কীমার কোম্পানির নাম শুনিনি, তবে দিলীপ গুপ্তকে না চিনলেও তাঁর ভাই এবং বোনের সঙ্গে পরিচয় অনেক দিনের। ললিতবাবুর প্ররোচনায় তাঁর সঙ্গে রামময় রোডে দিলীপ গুপ্তের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। সিঁড়ির পাশে খাঁচাবদ্ধ বিশাল অ্যালসেশিয়ান; তাকে পাশ কাটিয়ে দোতলায় উঠে প্যাসেজের শেষ প্রান্তে ডান দিকের বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম। মিনিট খানেকের মধ্যেই চটির ভারী শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে গুপ্তমশাই প্রবেশ করলেন। পরনে হাফশার্ট ও পায়জামা, চোখে পাওয়ার সম্বলিত টিনটেড চশমা, ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন দশাসই চেহারা। চেহারা দেখে বয়স বোঝার উপায় নেই।

আমার আসার কারণ তাঁকে জানালাম। ভদ্রলোক মিনিট দশেক নানান প্রশ্ন ক'রে আমাকে বাজিয়ে দেখার পর বললেন, 'একটা কাল্পনিক প্রডাক্ট নিয়ে ছবি ও ক্যাপশন সমেত গোটা চারেক বিজ্ঞাপনের খসড়া ক'রে অমুক দিন অমুক সময়ে পাঁচ নম্বর কাউনসিল হাউস স্ট্রীটে আমাদের আপিসে চ'লে এসো; রুম সাহেবের সঙ্গে তোমার মোলাকাত করিয়ে দেব।' সেইসঙ্গে একটা সতর্ক বাণীও উচ্চারণ করলেন এই মর্মে যে চাকরি যদিও বা পাই— 'দ্য স্থালারি উইল ব্রেক ইওর হার্ট'।

সেই বৈঠকেই কথা প্রসঙ্গে আমার পারিবারিক পরিচয় পেয়ে দিলীপ গুপ্ত জিগ্যেস করলেন, 'আবোল তাবোল হযবরল-র কী অবস্থা?' জানালাম

সেগুলো এখনও ছাপা হয় এবং বিক্রি হয়, তবে প্রকাশক আমাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখেননি। 'পয়সা দেয়?' প্রশ্ন করলেন দিলীপ গুপ্ত। জানাতে হ'লো আজ পর্যন্ত ওই দুখানা এবং উপেন্দ্রকিশোরের কোনো বই থেকে কোনো অর্থাগম হয়নি। দিলীপবাবু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন বটে, কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না।

কীমার কোম্পানিতে জুনিয়র ভিজুয়্যালাইজারের চাকরিতে যোগ দিই এর দুমাস পরে। তখন থেকেই দিলীপ গুপ্ত ওরফে ডি. কে.-র সঙ্গে সত্যিকারের পরিচয়ের সূত্রপাত। বিজ্ঞাপনের জগতে কীমারের তখন বেশ নামডাক এবং তাঁর অনেকটাই নাকি ডি. কে.-র দৌলতে। চলনে বলনে ভারভাতিক এই যুবকটি অল্প কালের মধ্যেই পাবলিসিটির চাবিকাঠিটি আয়ত্ত ক'রে ফেলেছেন। বিজ্ঞাপনে কী কী উপাদান থাকলে লোকের চোখ ও মন টানবে, কোন্ প্রডাক্টের পক্ষে কোন্ স্লোগান হবে সবচেয়ে লাগসই, লোগোটাইপের ধাঁচ কেমন হওয়া উচিত, খবরের কাগজের কোন্ পৃষ্ঠার কোন্ জায়গায় বিজ্ঞাপন দিলে সেটা মাঠে মারা যাবে না, এ-সবই তাঁর নখদর্পণে। সেইসঙ্গে মুদ্রণ-শিল্পের যাবতীয় কলাকৌশল সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। আর সবচেয়ে বড় কথা, এই কাজে এঁর যে অসীম উদ্দীপনা, সেটা তিনি কর্মীদের মধ্যে সঞ্চার করতে সক্ষম, যার ফলে চা-বিস্কুট-জিন্-সিগারেট-মোটরের টায়ার ইত্যাদির ক্যাম্পেন তাদের কাছে হ'য়ে ওঠে এক-একটি বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড।

আমি কাজে যোগ দেবার বছর খানেকের মধ্যেই ডি. কে. সিগনেট প্রেসের পত্তন করেন। উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার ও অবনীন্দ্রনাথের শিশু-সাহিত্য নিয়েই কাজ শুরু। প্রচ্ছদ অঙ্কন এবং প্রয়োজনে ইলাস্ট্রেশনের ভার দিলেন আমাকে। উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমারের বই ছাপাবার আগে কাগজে নোটিশ দিলেন যে বইগুলি পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে। যাঁরা এতদিন সেগুলি প্রকাশ করছিলেন তাঁরা এই নোটিশ অগ্রাহ্য করলেন। ফলে বেশ-কিছুদিন ধ'রে এই বইগুলির দুরকম সংস্করণ বাজারে চালু রইলো।

বাংলা বইয়ের অঙ্গসৌষ্ঠবে সিগনেট যে সম্পূর্ণ নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মূলে ছিলো ডি. কে.-র গভীর জ্ঞান, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং একরোখা পারফেক্‌শনিজ্‌ম। সিগনেটের আগে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন মহাশয় বিশ্বভারতীর অনাড়ম্বর গ্রন্থসজ্জায় সুরুচি ও

আভিজাত্যের একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ডি. কে. একটু ভিন্ন পথ ধরলেন। তাঁর মতে বইয়ের বহিরাবরণ হবে এমন যাতে দোকানের কাউন্টারে আর-পাঁচটা বই থেকে পৃথক হ'য়ে তা ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ ছাড়া বইয়ের চরিত্র অনুযায়ী তার আকার, আয়তন ও আভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জার রদবদলেও তিনি বিশ্বাস করতেন। এই পন্থা অচিরেই সিগনেটের বইয়ে একটা বৈশিষ্ট্য আরোপ ক'রে গ্রন্থপ্রকাশনার জগতে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো।

নতুন বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করার নানান অভিনব উপায়ও ডি. কে. উদ্ভব করেন। এ কাজে তাঁর বিজ্ঞাপনের অভিজ্ঞতাকে তিনি ষোলো আনা কাজে লাগিয়েছিলেন। এই উপায় যে কতটা কার্যকরী হয়েছিলো তা বোঝা যায় সিগনেট-প্রকাশিত কবিতার বইয়ের কাটতি থেকে। কাব্যগ্রন্থের ব্যাপক প্রচারের মূলে ডি. কে.-র অবদান বাংলার অনেক কবিই কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করবেন ব'লে আমার বিশ্বাস।

তবে প্রতিটি বইয়ে সিগনেটের নিজস্ব ছাপ বজায় রাখার প্রবণতা মাঝে মাঝে অসুবিধারও সৃষ্টি করেছে। যেমন, আমার ইচ্ছা ছিলো আবোল তাবোল ও হযবরল আগে যেমন ছিলো ঠিক তেমন ভাবেই সিগনেট প্রকাশ করুক। ডি. কে.-র তাতে ঘোর আপত্তি, এবং সে আপত্তির প্রকাশ এমনই জবরদস্ত যে কার সাধ্যি তাকে খণ্ডায়। ফলে বই দুটির সিগনেট-সংস্করণের সঙ্গে সুকুমার-পরিকল্পিত সংস্করণের অনেক প্রভেদ।

আরেকটা ব্যাপারে মতের অমিল মাঝে মাঝে বিরোধের সৃষ্টি করতো। সেটা হ'লো বানান সংস্কার। সুকুমার রায় লিখেছেন 'বেড়াল', সংশোধন ক'রে করলেন 'বেরাল'। তাঁকে কিছুতেই বোঝাতে পারিনি যে দু-য়ের মধ্যে ব্যঞ্জনার পার্থক্য আছে, এবং হযবরল-র ক্ষেত্রে বেরালের চেয়ে বেড়াল বেশি সংগত।

ডি. কে. যে অতীতে একটি চলচ্চিত্রপত্রিকা সম্পাদনা করতেন সে-খবর আমি জানি অনেক পরে। পত্রিকার নাম ছিলো খেয়ালী। চলচ্চিত্র সম্পর্কে আমি আগ্রহী জেনে ডি. কে. তাঁর নিজের উৎসাহের কথাটা বলেন। 'খেয়ালী' পত্রিকা বহুকাল গত হ'লেও ডি. কে.-র উৎসাহ তখনও অম্লান। এর পরিচয় বহন করে সিগনেট কর্তৃক প্রকাশিত বাংলায় চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সিরিয়াস প্রবন্ধের প্রথম সংকলন। 'পথের পাঁচালি'র চিত্ররূপ দেবার বাসনাটা

যখন তাঁকে জানাই তখন ডি. কে. অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। সত্যি বলতে কি, ডি. কে.-কৃত 'পথের পাঁচালি'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু' আমাকে চিত্রনাট্যের কাঠামো নির্ধারণ করতে অনেকটা সাহায্য করেছিলো।

চিত্র পরিচালনার কাজে নামতে হ'লে আমাকে যে বিজ্ঞাপনের ধরাবাঁধা চাকরি ছাড়তে হবে সেটা ডি. কে. নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন, কিন্তু সেইসঙ্গে হয়তো তাঁর ভরসা ছিলো যে ফিল্মের কাজের ফাঁকে ফাঁকে সিগনেটের কাজ ক'রে দিতে আমার অসুবিধা হবে না। সে ধারণা যে ভুল নয় সেটা পরে প্রমাণিত হয়েছিলো। 'পথের পাঁচালি' ছবি মুক্তি পাবার পর কীমারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে বেশ-কিছুদিন পর্যন্ত আমি সুযোগ পেলেই দুপুরে এলগিন রোডে ডি. কে.-র বাড়িতে গিয়ে একতলার আপিস ঘরে ব'সে সিগনেটের কাজ ক'রে এসেছি।

সিগনেটের দ্রুত ভাগ্যপরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করার সুযোগ বা প্রবৃত্তি কখনো হয়নি। ডি. কে.-র সঙ্গে আমার যোগসূত্র এমনিতেই ক্রমে ক্ষীণ হ'য়ে আসছিলো। একদিকে সিনেমার কাজের ক্রমবর্ধমান চাপ, অন্যদিকে পুনঃ-প্রকাশিত 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদনার কাজ। এরই মধ্যে বেশ-কিছুদিন পর্যন্ত বুঝতে পারতাম যে আমার ফিল্ম সম্পর্কে ডি. কে.-র উৎসাহ অব্যাহত আছে। আমার কোনো নতুন ছবি মুক্তি পাবার অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর কাছ থেকে আসতো একটি অভিনন্দনমূলক চিঠি। সিগনেটের বইয়ের একটি পৃষ্ঠার মতোই সুদৃশ্য ও পরিচ্ছন্ন সেই চিঠি। হস্তাক্ষর ছাপার হরফের মতোই স্পষ্ট ও সুগঠিত, ভাষা অনুচ্ছ্বাস হওয়া সত্ত্বেও আন্তরিকতায় পূর্ণ। এই চিঠিগুলোর দিকে চাইলে আজও বুঝতে পারি যে চারিদিকের অবিন্যস্ত দায়সারা ঢিলে-ঢালা কাজের ভীড়ের মধ্যে ডি. কে.-র সামান্যতম কাজও এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রমের পরিচয় বহন করতো।

ডি. কে. এবং তরুণ কবিরা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দিলীপকুমার গুপ্ত যখন বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে খ্যাতিমান প্রকাশক, শুধু খ্যাতিমান নন, রুচিবান এবং সব দিক দিয়ে আধুনিকতম, সেই সময় তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। এই সব সার্থক মানুষদের সঙ্গে সাধারণত অজ্ঞাতকুলশীল ছেলেছোকরাদের কোনো যোগাযোগ থাকে না, দেখা হ'লেও কথা বলার সময় থাকে না। কিন্তু সেদিন সেই প্রথম পরিচয়েই তিনি আমাদের সঙ্গে চার ঘণ্টা কেন কাটিয়েছিলেন, সেটা আমার কাছে আজও একটা বিস্ময়। বস্তুত সেই দিনটিতেই আমার জীবনের একটা মোড় ঘুরে যায়। তার আগে আমি কোনো সোফা-সাজানো বাড়িতে যাইনি। তিনি আমাদের দ্বিগুণ বয়সী ছিলেন কিন্তু সম্বোধন করছিলেন 'আপনি' ব'লে এবং বিশ্বের যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন ঠিক বন্ধুর মতন। এবং যেরকম আতিথেয়তা করেছিলেন, তা এখনকার দিনে আর কোথাও পাওয়া যাবে কি না, সে-সম্পর্কে আমার গভীর সন্দেহ আছে।

দিলীপকুমার গুপ্ত আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন দুটি কাজে। তার আগে হাওয়ায় ভেসে বেড়াতুম সেই আমাদের প্রথম কাজে নামা। তাঁর প্ররোচনা বা পরিকল্পনায় আমরা প্রকাশ করি কবিতার পত্রিকা 'কৃত্তিবাস'। যেমন-তেমন ভাবে কিছু রচনা ছাপিয়ে মলাটে মুড়ে বাজারে ছাড়ার নামই যে পত্রিকা সম্পাদনা বা প্রকাশ করা নয়, এ কথা তিনি বুঝিয়েছিলেন আমাদের। প্রতিটি রচনার প্রতিটি শব্দ সম্পর্কে সম্পাদকের দায়িত্ব আছে, বিশেষত লিট্‌ল ম্যাগাজিনের। এবং লিট্‌ল ম্যাগাজিন শুধু নতুন ধরণের রচনাই ছাপবে না, তার লে-আউট, গেট-আপ এবং সামগ্রিক চেহারাও নতুন হবে। মনে আছে, কৃত্তিবাসের প্রথম সংখ্যার মলাটটি আমরা দু-বার ছাপিয়েছিলাম, তাঁর আপত্তিতে। প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বার ছাপার খরচ পড়েছিলো অনেক কম। কী ক'রে কম খরচে বেশি ভালো ছাপা যায়, তিনি আমাদের এই শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় কাজ, আমাদের সম্মুখে রেখে একটা নাটকের দল গড়া। এ রকম একটি পরিকল্পনা তাঁর নিজেরই ছিলো আগে থেকে, আমাদের পেয়ে তিনি

মেতে উঠলেন একেবারে। মোটাসোটা চেহারার দীর্ঘকায় মানুষটি ছিলেন আসলে লাজুক ধরনের, বেশী লোকজনের সামনে তিনি মন খুলতে পারতেন না, কিন্তু এই ঘরোয়া নাট্যদলে তাঁর উৎসাহ ছিলো বিস্ময়কর। তিনি নাট্যকার নন, পরিচালক নন, অভিনেতা নন, অথচ নাটকদলটির তিনিই প্রাণ পুরুষ। আমাদের নাট্যদল 'হরবোলা' বাংলা নাট্যআন্দোলনে হয়তো কোনো ছাপই রেখে যেতে পারেনি, কিন্তু তেমন ভাবে নাটকের মহড়া বা প্রযোজনার কথা আজ কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। কারণ এ-রকম একটি বিশাল কল্পনাপ্রবণ মানুষ, টাকাপয়সা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-হিসেবী, শিল্প থেকে আনন্দ পাওয়াই যাঁর প্রধান আকর্ষণ, তেমন মানুষ আমি আর একজনও দেখিনি।

নাটক-অভিনয় উপলক্ষে তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে চার-পাঁচ বছর নিয়মিত যাতায়াত আমার জীবনের স্বর্ণযুগ। আমাদের মোশান মাস্টার ছিলেন কমলকুমার মজুমদার, সংগীতশিক্ষক ছিলেন কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র অর্থাৎ বটুকদা এবং ফৈয়াজ খাঁর শিষ্য সন্তোষ রায়। নাটকের মহড়ার চেয়েও আমাদের কাছে প্রধান আকর্ষণীয় ছিলো এই সব ব্যক্তিদের আলাপচারি শোনা। কমলকুমারকে মনে হ'তো রামকৃষ্ণ-কেশব সেনের সমসাময়িক, যদিও হাতে প্রুস্ত-এর মূল ফরাসী উপন্যাস, তাঁর গল্পের ভাঁড়ার অফুরন্ত। বটুকদা রবীন্দ্রপরবর্তী সাহিত্যযুগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত এবং আই. পি. টি.-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, হাসতে-হাসতে নানা রকম চুটকিলা ছাড়ার অপূর্ব দক্ষতা ছিলো তাঁর। আবার সন্তোষ রায় শোনাতেন বিখ্যাত সব ওস্তাদ ও বাঈজীদের কাহিনী। আমাদের আড্ডা কবে যে কোন্ দিকে যাবে তার কোনো ঠিক ছিলো না। তখনও সত্যজিৎ রায় পথের পাঁচালি তোলেননি, তাঁকে জানতুম সিগনেট প্রেসের বইগুলির প্রচ্ছদশিল্পী হিসেবে, তাঁকে দু-একবার দেখেছি। হঠাৎ-হঠাৎ এসে পড়তেন সৈয়দ মুজতবা আলী কিংবা সুভাষ মুখোপাধ্যায়। নরেশ গুহ অন্য একটি ঘরে কাজ করতেন।

আড্ডাধারী হিসেবে দিলীপকুমার অর্থাৎ ডি. কে.-র ভূমিকাটি ছিলো বিচিত্র। এরকম উৎসাহী শ্রোতা দেখা যায় না। অতবড় চেহারার পুরুষটির মুখখানা শিশুর মতন, এবং ঘন-ঘন ঘাড় নাড়া ছিলো তাঁর মুদ্রাদোষ। কেউ কোনো বুদ্ধিমানের মতন কথা বললে তিনি হাসি মুখে, ঘন-ঘন ঘাড় নেড়ে নিঃশব্দে তারিফ করতেন। যাকে বলে স্মল্ টক্, অর্থাৎ নিছক কথার জন্য কথা বলা তিনি একদম পছন্দ করতেন না। এবং কমলদা কিংবা বটুকদা কোনো

হাস্যরোল-তোলা গল্প বলার পর ডি. কে. একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলতেন, এটা শুনেছেন? তারপরই তিনি ঠিক একটি পরিপূরক গল্প বলতেন। প্রত্যেক গল্পেরই একটি পরিপূরক গল্প তাঁর জানা। এবং প্রকৃত রসিকের লক্ষণ এই, তাঁরা ঠিক সময় ঠিক গল্পটি বলতে জানেন।

বাঙালী প্রকাশকরা সম্প্রদায় হিসেবে খুব একটা শিক্ষিত, এমন প্রমাণ নেই। কিন্তু বাংলা সাহিত্য এবং ইওরোপীয় সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর একই রকম প্রবল আগ্রহ ছিলো। আমরা সেই সময়ে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই'-এর শুধু নামই শুনেছি; চোখে দেখার কোনো উপায় ছিলো না, একদিন তিনি আমাদের প্রায় পুরো বইটির কাহিনীগুলি শুনিয়ে আমাদের বিস্মিত করেছিলেন। আর একদিন কথাপ্রসঙ্গে ফ্রান্‌ৎস্ কাফ্‌কা-র-'মেটামরফসিস্' গল্পটির প্রসঙ্গ ওঠে, তিনি সমগ্র গল্পটিই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বলতে শুরু করলেন। আমরা তখন সদ্য কলেজের ছাত্র, তখনও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে কাফ্‌কা কিংবা রিল্‌কে পড়া ফ্যাশান হিশেবে চালু হয়নি, ডি. কে.-র কাছেই আমি অন্তত কাফ্‌কার নাম প্রথম শুনি। তার পর তিনি আমাকে কাফ্‌কার একটি বই পড়ার জন্য ধার দিয়েছিলেন। তখন আমি জানতুম না যে ছাত্র বয়েসে ডি. কে.-র গৃহশিক্ষক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু।

বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার জগতে ডি. কে. যে আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন, সে-কথা সুবিদিত। এ-সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে পারবেন বিশেষজ্ঞরা। নানান কথার ফাঁকে-ফাঁকে আমরাও তাঁর কাছ থেকে কিছু-কিছু শিখেছিলুম, একটা কথা এখনো মনে আছে: লেক্‌স অ্যাণ্ড রীভারস্। যে-কোনো সাধারণ একটি ছাপা বইয়ের পৃষ্ঠা দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন, দেখেছো, ভেতরে-ভেতরে কত লেক্‌স অ্যাণ্ড রীভারস্ রয়ে গেছে। অর্থাৎ হ্রদ ও নদী। ছাপা শব্দের মাঝখানের ফাঁক সম্পর্কে অনেকেই সচেতন নন। লাইন আঁটাবার জন্য যেখানে সেখানে যেমন খুশি স্পেস্-এর ব্যবহার হয়, তার ফলে যে-সব বিসদৃশ ফাঁক থেকে যায়, তা দেখে সত্যিই যেন মনে হয় ছাপা পৃষ্ঠার মাঝে-মাঝে হ্রদ জমেছে কিংবা নদী ব'য়ে চলেছে। তারপর থেকে প্রুফের পাতায় এই লেক্‌স অ্যাণ্ড রীভারস্ খোঁজা আমার বাতিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো। যে-সব ছোটো খাটো প্রেস থেকে আমরা কবিতার 'কৃত্তিবাস' ছেপেছি, সেখানে এই লেক্‌স অ্যাণ্ড রীভারস্-এর কথা শুনে মালিকরা একেবারে হাঁ।

বাংলা কবিতার জগৎ ডি. কে.-র কাছে চিরঋণী। রবীন্দ্রনাথ নিজের বই ছাপার জন্য শেষ পর্যন্ত বিশ্বভারতী খুলেছিলেন। রবীন্দ্রপরবর্তী কবিরা প্রকাশকদের কাছে ছিলেন অপাঙ্‌ক্তেয়। আধুনিক কবিতা পাঠকদের কাছে ছিলো অবজ্ঞার বস্তু। ডি. কে. একই সঙ্গে পাঠকদের সচেতন করলেন, এবং কবিদের দিলেন যোগ্য সম্মান। শুনেছি ডি. কে. যখন জীবনানন্দ দাশের কাছে 'বনলতা সেন' ছাপবার প্রস্তাব দেন, তিনি খুবই অবাক হয়েছিলেন। একটা পুরোনো বই ছাপাবার জন্য অতবড় একটি প্রকাশনালয়ের আগ্রহ? আমাদের নাটুকে দল 'হরবোলা' চলার সমসাময়িক কালেই 'বনলতা সেন' ছাপা হয়। জীবনানন্দ দাশকে কয়েকবার আসতে দেখেছি, একটিও কথা হয়নি, আমরা তো তখন শৌখিন অভিনেতা মাত্র! ঠিক একই সময়ে, যখন ডি. কে. জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ ছাপছেন, তিনি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও নরেশ গুহ নামে দু-জন তরুণ কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন, ঠিক একই রকম গুরুত্ব দিয়ে। হায়, এ-রকম প্রকাশক আজ আর কোথায়! অবশ্য এমন হুতাশ করার কোনো মানে নেই, দিলীপকুমার গুপ্ত সব দিক থেকেই ছিলেন এক মূর্তিমান ব্যতিক্রম। এমনই তাঁর ব্যবসাবুদ্ধি যে তিনি যাযাবর রচিত 'দৃষ্টিপাত' অমনোনীত ক'রেছেন, কারণ ওতে লেখক মৃত, এই মিথ্যে পরিচয় দেওয়া হয়েছিলো (সে-বই বিক্রি হয়েছিলো তিরিশ না পঞ্চাশ সংস্করণ), আবার কবিতার বই ছাপছেন মহোৎসাহে।

একটি কবিতাসংকলন এবং একটি কবিসম্মেলনের জন্যও তিনি স্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন। অনেক কাব্যসংকলনই তো বেরোয়, কিন্তু ডি. কে. প্রকাশ করেছিলেন মাত্র একটি, আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত 'পঁচিশ-বছরের প্রেমের কবিতা'। যখন বইটি বেরোয়, তখন পাঠকমহলে যে উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিলো, পরে আর কোনো কাব্যগ্রন্থের ব্যাপারে সে-রকম কাণ্ড আজ অবধি দেখা যায়নি। প্রতিটি বইয়ের সঙ্গে ক্রেতাকে দেওয়া হয়েছিলো একটি সুগন্ধী লাল গোলাপ। মনে আছে বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীটের সিগনেট প্রেস দোকান থেকে ঐ রকম একটি গোলাপ পেয়ে শিবরাম চক্রবর্তী বলেছিলেন কী মুস্কিল বলো তো, এমন গোলাপটি উপহার দেবার জন্য আমি তেমন সুন্দরী মেয়ে খুঁজে পাই কোথায়?

বাংলা দেশে এ-পর্যন্ত যত কবিসম্মেলন হয়েছে, তার মধ্যে ডি. কে-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কবিসম্মেলনটিই এখনো যে বৃহত্তম তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ডি· কে·-র সমস্ত পরিকল্পনাই ছিলো বিরাট। আমাদের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালার জন্য ডি· কে· ভেবেছিলেন যে রাবণের কুড়িটি হাত এবং দশটি মাথা হবে ফোল্ডিং কিংবা কোলাপ্‌সিবল্‌, তিনি অর্ডার দিয়ে বানাবেন। রাবণ-বেশী তাঁর শ্যালক, আমাদের বন্ধু বুড্‌ঢা তাতে রাজি হয়নি ব'লে সেটা শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায়। সেই রকম, কবিসম্মেলনের জন্যও তিনি নির্বাচন করেছিলেন কলকাতার বৃহত্তম হল্‌টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হল, যাতে অন্তত পাঁচ হাজার লোক ধরে। কবিসম্মেলনে অত লোক আসার চিন্তাই উদ্ভট, অথচ শেষ পর্যন্ত হল্‌ উপছে বাইরের ট্রামরাস্তা পর্যন্ত ভিড় জ'মে গিয়েছিলো। দু-দিন ধ'রে হয় সেই কবিসম্মেলন, এবং সবচেয়ে মজার কথা, মূল অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগে হ'য়ে গিয়েছিলো একটি রিহার্সাল্‌। কবিতা-পাঠও একটা আলাদা শিল্প এবং লোক ডেকে এনে যেমন-তেমন ভাবে কবিতা শুনিয়ে দেওয়া অন্যায়, এই ছিলো ডি· কে·-র অভিমত। এসব কথা কেউ আগে শোনেনি। মনে আছে, সেই কবিসম্মেলনে জীবনানন্দ দাশ পড়েছিলেন পর পর আটটি কবিতা, কারুকে অনুরোধ করার সুযোগ পর্যন্ত দেননি, সম্ভবত কান বন্ধ ক'রে তিনি ঝড়ের বেগে কবিতাগুলি প'ড়ে হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর শ্রোতাদের শত অনুরোধেও আর কর্ণপাত না ক'রে হঠাৎ প্রস্থান। সেই কবিসম্মেলনে কনিষ্ঠতম কবি হিসেবে আমিও স্থান পেয়েছিলাম ব'লে আজও আমার গর্ব বোধ হয়।

ডি· কে·-র সেই উদ্যোগের পর থেকেই এ-দেশের নানা প্রান্তে কবি-সম্মেলনের ধুম প'ড়ে যায়!

ডি· কে· এবং কমলকুমারের মিলিত অধ্যায়টি আমার জীবনে দারুণ প্রভাব বিস্তার ক'রে আছে। অনেক ঘটনাই মনে পড়ে, সব লেখার সুযোগ এখানে নেই। ডি· কে· প্রসঙ্গে দু-টি ঘটনার উল্লেখ শুধু এখানে করতে চাই।

আমার বিবাহের সময় আমি ডি· কে·-কে নিমন্ত্রণ করেছিলাম, তিনি আসেননি। সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি যেতেন কদাচিৎ। বাড়ি এবং অফিস ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় তাঁকে প্রায় দেখাই যেতো না। মাঝে-মাঝে বাচ্চাদের নিয়ে গাড়িতে বেড়াতে বেরুতেন। কিংবা অনেক রাত্রে, তিনি নিজে গাড়ি চালিয়ে কলকাতার দূর-দূর প্রান্তে আমাদের পৌঁছে দেওয়া খুব পছন্দ করতেন সে-সময়। সবচেয়ে প্রিয় ছিলো তাঁর বাড়িতে ব'সে কাজ এবং আড্ডা এবং পড়াশুনো। নিমন্ত্রণ-বাড়িতে ভিড়ের মধ্যে তাঁকে সত্যিই যেন মানাতো না।

আমার বিবাহ অনুষ্ঠানে তিনি আসেননি কিন্তু লোক মারফৎ উপহার পাঠিয়েছিলেন। বিয়ের সময় কার কাছ থেকে কী উপহার পাওয়া গেলো তা কি কেউ পরে মনে রাখে? কিন্তু ডি· কে·-র উপহার আমি আজও মনে রেখেছি। তিনি পাঠিয়েছিলেন একটি প্রায় এক কেজি ওজনের মাছ, সেটি ক্ষীরের তৈরি, একটি কড়ি বসানো লাল লক্ষ্মীর ঝাঁপি, তার মধ্যে একটি রুপোর টাকা এবং একটি সোনালি মলাটের বই, তার নাম 'বাংলার ব্রতকথা'। উপহার পাঠাবার সঙ্গে তাঁর যে অনেকখানি চিন্তা যুক্ত হয়েছিলো, সেটাই সুখস্মৃতি হ'য়ে আছে।

আর একটি ঘটনা। সত্যজিৎ রায় তখন বিশ্বখ্যাত হয়েছেন। তাঁর প্রত্যেকটি ফিল্‌ম্‌ আমাদের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। ডি· কে· সত্যজিতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর নিন্দে এবং প্রশংসা দুটোই ছিলো অত্যন্ত চড়া রঙের। যা পছন্দ করতেন না, তা একেবারে নাক কুঁচকে উড়িয়ে দিতেন, আর ভালো লাগার জিনিসের প্রশংসা করতেন বুকের দরজা হাট ক'রে। সেই সময় শোনা গিয়েছিলো সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' ফিল্‌ম্‌ করবেন। আরও শোনা গিয়েছিলো, সত্য মিথ্যে যাই হোক, তিনি সুচিত্রা সেনকে নেবেন বিমলার ভূমিকায়। একদিন কথা প্রসঙ্গে ডি· কে· হঠাৎ বলেছিলেন, মানিক যদি সুচিত্রা সেনকে নেয়, তা হ'লে আমি আত্মহত্যা করবো। তুমি ভেবে ছাখো একবার, বিমলার মুখ, তার তাকানো, সেই জায়গায় সুচিত্রা সেন? আমি সত্যিই আত্মহত্যা করবো।

ডি· কে·-র অতখানি তীব্র প্রতিক্রিয়ার মর্ম আমি সেদিন বুঝতে পারিনি। উনি কি মনে মনে উপন্যাসের ঐ নায়িকাটির প্রেমিক ছিলেন? যে ফিল্‌ম্‌ তখনো তৈরি হয়নি, সেই ফিল্‌মের একটি সম্ভাব্য চরিত্র সম্পর্কে মানুষ অতখানি মর্মাহত হ'তে পারে কী ভাবে? একেবারে আত্মহত্যার কথা? বেশ জোর দিয়ে বলেছিলেন ডি· কে·, নিছক কথার কথা নয়, অনেকটা হাহাকারের মতন, আমার আজও কানে বাজে।

কী জানি সত্যজিৎ রায় কেন তারপর কিংবা আজও 'ঘরে বাইরে' নিয়ে ফিল্‌ম্‌ তোলেননি।

প্রমা কাহিনী

সুরজিৎ ঘোষ

১৯৭৮ সালে বন্যা সাঁতরে প্রমা পত্রিকার জন্ম। জন্মের ঠিক পরেই যখন স্বাভাবিক কারণেই প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা থাকে, তখনই প্রমা-কে পড়তে হল দীর্ঘস্থায়ী প্রেস-স্ট্রাইকের মুখে। ফলে অনিয়মিত হওয়ার সমস্ত সুযোগ ও সম্ভাবনা যেমন তার ছিল, তেমনি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল তার পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা। আজ, চার বছর পূর্ণ করার মুখে এসে দাঁড়িয়ে এটুকু দাবি করা যায় যে আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি প্রাকৃতিক ও সামাজিক সমস্ত রকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রমার তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা পর্যন্ত পনেরোটি সংখ্যা নিয়মিতই বার করেছি। একটিও বাদ না দিয়ে এবং একটিও যুগ্ম সংখ্যা না করে। কোনো কৃতিত্বের দাবি হিসাবে নয়। নিছক তথ্য হিসেবেই এটুকু জানানো।

বহুকথন একটি মহৎ দোষ। আমার চরিত্রে তা একটু বেশি মাত্রায় বিদ্যমান। ফলে বলতে বসে আগের কথা পরে এবং পরের কথা আগে এসে যাচ্ছে। প্রমা-র জন্ম লগ্নের কথা বলার আগে তার প্রস্তুতির কথা বলা উচিত। প্রমা প্রকাশের আগে বর্তমান প্রতিবেদকের একটি বিখ্যাত কবিতা পত্রিকা সম্পাদনার ব্যাপারে কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু এক সময় তিনি দেখলেন যে লেখার ব্যাপারে কবিতা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় হলেও সম্পাদনার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ, কবিতা ছাড়িয়ে সমগ্র সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের প্রতি। ক্রমে তিনি এই সব বিষয় নিয়ে একটি প্রবন্ধ পত্রিকা প্রকাশের কথা ভাবতে লাগলেন। কিন্তু 'যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না একার' কাজেই তিনি দ্বারস্থ হলেন তাঁদের কাছে যাঁদের এ দুরূহ কাজ সাধ্যাতীত নয়। কবি অরুণ মিত্র, পবিত্র সরকার এবং শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সাগ্রহে প্রশ্রয় দিলেন এই প্রতিবেদকের পরিকল্পনায়। তৈরি হল প্রমার সম্পাদকমণ্ডলী।

প্রথম পুরুষের নৈর্ব্যক্তিক বাতাবরণ ছেড়ে এবারে নিজের প্রসঙ্গ 'আমি' করেই বলি। প্রমার সম্পাদক আসলে চারজন। একটু আগে উল্লিখিত তিনজন এবং আমি। তবু যে সম্পাদক হিসেবে আমার নাম আলাদা করে

থাকে, তা সম্পাদনার জন্য ততটা নয়, যতটা সম্পাদনের জন্য। অর্থাৎ একজিকিউটিভ এডিটর আর কি। না হলে লেখা নির্বাচন, কপি সংশোধন, মায় প্রুফ রীডিং সব কাজই আমরা ভাগাভাগি করে করি। আর শুধু তো চারজনই নই, মহাশ্বেতা দেবী আর অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে যুক্ত না হয়েও প্রথম থেকেই আমাদের সঙ্গে এত রকম ভাবে জড়িয়ে আছেন যে অনেক কাজ অনেক সময় নিঃশব্দে তাঁদের হাতেই হয়ে যায়।

তবু কি আমরা করতে পেরেছি তেমন একটি কাগজ, যা আমরা করতে চেয়েছি বা চাই। কোনোরকম বিনয় না করেই বলা যায় যে তা আমরা পারিনি। সমাজনীতি, অর্থনীতি বা বিজ্ঞান বিষয়ে নিয়মিত ভালো-লেখা আমরা লেখাতে পারিনি। চিত্রকলা বা সংগীত বিষয়েও তেমন পেরেছি কি? আমাদের সামর্থ্য কম, কিছু কিছু লেখক হয়তো উৎসাহী হননি সে কারণে। আবার আমাদের সম্পাদনা লেখার যে মান আশা করে অনেকে হয়তো তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রম করতে অনিচ্ছুক। তবু আমরা যা পারিনি, তার দায় আমাদেরই।

প্রমা পত্রিকার কথা বলতে বসে তার যমজ প্রমা প্রকাশনীর কথা তোলা কি একটু অপ্রাসঙ্গিক হবে? বোধ হয় না। কেননা প্রমা পত্রিকা প্রমা প্রকাশনীর বাই-প্রোডাক্ট নয়, বরং উল্টোটাই অনেকাংশে সত্যি। এ বিষয়ে অনেকের যে ভুল ধারণা আছে তার নিরসন দরকার। কী করে প্রমা পত্রিকা করতে করতে প্রমা প্রকাশনীর জন্ম হল তা কলেজ স্ট্রীট কাগজে পাঁচ কাহন করে লিখেছি, (সাতকাহন করে লিখতে লজ্জা করেছে বলে) তাই তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে আর করলাম না। শুধু বর্তমান পরিসরে এটুকু বলে রাখাই যথেষ্ট হবে যে প্রমা পত্রিকা আর প্রমা প্রকাশনীর উদ্দেশ্য প্রায় একই ধরনের রচনা একই উদ্দেশ্যে প্রকাশ করে যাওয়া। অনেক সময় অনেক অনেক লেখা প্রমায় আগে প্রকাশিত হয়ে পরে বই হয়েছে, যেমন ব্রেশ্‌টের কবিতা ও গান, সার্ত্র্‌ ও তাঁর শেষ সংলাপ, নাটমঞ্চ নাট্যরূপ, স্বভাবত স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ, ইত্যাদি। অতিরিক্ত বলতে প্রমা প্রকাশনী কবিতার বই প্রকাশ করে, যদিও প্রমা পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত হয় না। আসলে একটি ভারী প্রবন্ধের কাগজে টুকরো করে কয়েকটি কবিতা ছাপার আমরা কোনো সার্থকতা দেখতে পাইনি। তার চেয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতার বই করাকে কবিতা-মনস্কতার দিক দিয়ে অনেক স্থায়ী কাজ বলেই আমরা মনে করি। তবে

প্রমা প্রকাশনীর কাছে প্রমা পত্রিকা একটা বিষয়ে কৃতজ্ঞ, দিলীপ গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার পাওয়ার দু'বছর আগেই প্রকাশনী অর্জন করেছে প্রকাশনা ও মুদ্রণ-সৌকর্যে সর্বভারতীয় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তার 'সুরদাস সঞ্চয়িতা' গ্রন্থের জন্য। তাতে আর কিছু না হোক প্রমা-র নাম অনেকের কাছেই পরিচিত হয়ে উঠেছে।

প্রমা-র সম্পাদকীয় নীতি সম্বন্ধে দু-একটা কথা পরিষ্কার করে বলি। আমরা ধ্রুপদী সাহিত্যের অনুবাদে প্রবল আগ্রহী। তবে পাঠকদের দুবার অনুবাদের সমস্যা থেকে যথাসাধ্য রক্ষা করবার জন্য আমরা বাংলা অনুবাদক হিসেবে কেবল তাঁদেরই দ্বারস্থ হই যাঁরা মূল ভাষা ও বাংলা দুইই জানেন। তরুণদের লেখা প্রকাশ করি না এই অপবাদ থেকে বাঁচবার জন্য এবং ভালো গল্পের কাগজ না থাকার কারণে এই প্রবন্ধ-প্রধান কাগজটিতে আমরা গল্পের জন্য অনেকটা জায়গা দিয়ে থাকি। আমরা মনে করি নানা বিষয়ে আমাদের ভাবনা-চিন্তাগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নেওয়া দরকার, সেজন্য আমাদের ভাবনা-চিন্তা বলে একটি বিভাগ আছে যা অনেকটা সেমিনার ধর্মী। সবচেয়ে বড়ো কথা, আমরা সামাজিক দায়বদ্ধতায় বিশ্বাস করি। আমাদের সমস্ত রচনার আয়োজনেই যদি তার ছাপ পাঠক আবিষ্কার করেন তো আমরা খুশি হবো। আমাদের দেশ ও আন্তর্জাতিক মানচিত্রের বিভিন্ন সমকালীন প্রসঙ্গের মধ্যে যে দীর্ঘস্থায়ী ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা নিয়ে আমাদের প্রবন্ধ-প্রতিম রচনা সমকাল-প্রসঙ্গ প্রায় সব সংখ্যাতেই বর্তমান। আর, কোনো সংখ্যায় গ্রন্থ প্রসঙ্গ বাদ গেলে আমাদের মনে হয় সে সংখ্যাটি অসম্পূর্ণ।

এই সব আমাদের ভালোবাসার কথা, আশার কথা, আকাঙ্ক্ষার কথা। হয়তো শুনতে ভালো লাগছে না। কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলী ও বিভাব সম্পাদক যখন কেবল পুরস্কার দিয়েই ক্ষান্ত হননি, কিছু লিখবারও সুযোগ দিয়েছেন তখন না শুনিয়ে কি আর ছাড়ছি? এখনও তো আসল কাজই বাকি, অর্থাৎ ঋণস্বীকার। কলকাতা এবং জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়া বই মেলার কাছেই তো প্রথম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। এই সব বই মেলার মাধ্যমে প্রমা বহু লেখক পাঠকের সঙ্গে সরাসরি আত্মীয়তা স্থাপন করতে পেরেছে। কিন্তু শুধু কি আর সম্পাদকদের পক্ষে সম্ভব এই বিশাল আয়োজনের প্রস্তুতি। না। তার জন্য রয়েছে প্রমার অন্য সহযোগীরাও। বস্তুতপক্ষে প্রমার নির্বাহী সহযোগী শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায় না থাকলে এত কাজের অর্ধেকও হতো কিনা সন্দেহ। ৭৯-র শেষ দিক থেকেই সে আমাদের সঙ্গে আছে। ছাপার হরফে যদিও ৮০-র অক্টোবর

সংখ্যা থেকে। এই রোগা ছেলেটি প্রমার এতো রকম ভার নিয়ে এমনিতেই এত বিব্রত যে তার উপরে আর প্রশংসার লক্জাটা চাপিয়ে দিচ্ছি না। শান্তনুর সূত্র ধরেই এসেছে দেবব্রত রায়, কলরব রায়, গোপাল লাহিড়ী, পার্থ সেন। এদের মধ্যে দেবব্রত ছাড়া আজ প্রমার অধিকাংশ লে-আউট, ডিজাইন, ক্যামেরা বা বিজ্ঞাপনের কাজ আটকে থাকে। বুদ্ধদেব চ্যাটার্জির মতো ছেলে বা শেখর শর্মার মতো সহযোগীকে পাওয়াও প্রমার সৌভাগ্যের কথাই প্রমাণ করে। আর একজন বিজয় দাশগুপ্ত প্রমার সূচনা পর্ব থেকে অক্লান্ত যোদ্ধা। ইদানীং চাকরি সূত্রে এত জড়িয়ে পড়েছে যে আর আমাদের সময় দিতে পারে না। এরা কেউই প্রমার কাছে অর্থ-সম্পর্কে আসেনি, যেমন আসেননি আমাদের পত্রসচিব শর্মিলা বসু বা বই মেলার অক্লান্ত লাইব্রেরিয়ান মৈত্রেয়ী সরকার। প্রমাকে শুধুমাত্র একটি পত্রিকা নয়, একটি সামগ্রিক আন্দোলন হিসাবে বিশ্বাস করেন বলেই এঁরা পরিবারভুক্ত হয়েছেন। যেমন হয়েছেন লেখকদের মধ্যে নারায়ণ সান্যাল, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রফুল্ল রায়, দীপংকর দাশগুপ্ত, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, কল্যাণ মজুমদার, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, জয়ন্ত জোয়ারদার, আদিনাথ ভট্টাচার্য, সন্তোষ চক্রবর্তী বা শচীন দাশ। শচীন অবশ্য এত বেশি রকম জড়িয়ে আছে যে তাঁর কথা নানা প্রসঙ্গেই এসে পড়ে। এ ছাড়া আছেন অসংখ্য বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী যাঁদের সকলের নাম দিতে গেলে মিনিয়েচার টেলিফোন পঞ্জিকা হয়ে যাবে।

কিন্তু এ লেখা শেষ করবার আগে আর একজনের কথা তো বলতেই হবে। তাঁর নাম স্নেহাকর ভট্টাচার্য। প্রমার তিনি বন্ধু ছিলেন। আমার অগ্রজ হিসেবে। আজ যখন প্রমার সামনে আনন্দিত মুখগুলো ঝলমল করছে, আমি দেখতে পাচ্ছি সেই দীর্ঘদেহী মানুষটি ঈষৎ ঝুঁকে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর মাথায় এক আশ্চর্য মুকুট যা পরলে মানুষ অদৃশ্য হয়ে যায়।

সত্যিকারের নতুন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

খুব সম্ভবত বুদ্ধদেব বসুই প্রথম আমাদের সাহিত্যে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের প্রকৃত চরিত্র বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে লেখেন। তার আগেও এই জাতের পত্রিকা বাংলা ভাষায় বেরিয়েছে, কিন্তু ঐ লেখাটির পরই লিট্‌ল ম্যাগাজিন সংজ্ঞাটি মুখে মুখে চালু হয়। আজ থেকে অন্তত ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেই লেখাটি, বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সংগ্রহে সেটি নিশ্চয়ই আছে, এখনকার নবীন পত্রিকা-সম্পাদকগণ সেই প্রবন্ধটি পড়ে নিলে পারেন। তা হলে বোধহয় 'লিট্‌ল ম্যাগাজিনের রাজা' কিংবা অপ্রতিদ্বন্দ্বী লিট্‌ল ম্যাগাজিন, এই সব বিশেষণ প্রয়োগ করতে তাদের কলম দ্বিধান্বিত হবে।

লিট্‌ল ম্যাগাজিনে ক্ষুদ্রত্বের কোনো প্রশ্ন নেই বলেই অবকাশ নেই হীনমন্যতার, আবার খুব বেশি হামবড়া ভাবটাও এর চরিত্র নষ্ট করে। প্রগল্‌ভতা জিনিসটা অসারত্বই প্রমাণ করে, যেন বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন বলে অনেক চটুল-সুন্দর মিথ্যে, সেই রকমই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের উদ্যোক্তাদের প্রথমেই সাবধান হতে হবে আত্মগরিমা প্রচারের বিষয়ে। কোনো বিষয়ে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছে যে, তার মনোবলই প্রধান সম্পদ ; যার যত মনোবল কম, তার পিঠেই দেখা যায় বেশি বড় জয়ঢাক। এই সব কথা হয়তো খানিকটা উপদেশের বাণীর মতন শোনাচ্ছে, তা লিট্‌ল ম্যাগাজিন বিষয়ে কিছু আপ্তবাক্য উচ্চারণ করার যোগ্যতা আমি অর্জন করেছি বোধ হয়। হিসেব করে দেখেছি, কৃত্তিবাস পত্রিকার প্রথম সংখ্যা যখন বেরোয়, তখন আমার বয়েস উনিশ, অর্থাৎ আমার বর্তমান জীবনের অর্ধেকের চেয়েও ঢের বেশি বয়সে আমি এই ধরনের পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।

একথা ঠিক, ১৯৫৩ সালের তুলনায় ধরা যাক ১৯৭৫ সালে বাংলায় ছোট ছোট গোষ্ঠী-পত্রিকা বেরিয়েছে বহুগুণ বেশি। আমাদের লেখালেখি শুরু করার অঙ্কুর-জীবনে এরকম পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ছিল পাঁচ-সাতটি মাত্র। আর ১৯৭৫ সালে অন্তত পঁচাত্তরটি তো হবেই। তখন সংখ্যায় কম ছিল বলেই প্রত্যেকটিকে আলাদা করে চেনা যেত, এখন সেটা একটা সমস্যা। তবু এই সংখ্যা বৃদ্ধিকে আমি সুস্বাস্থ্যের অঙ্গ বলেই মনে করি। লেখার বাসনা যার আছে, তার জন্য

প্রকাশের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। প্রান্তসীমার ছোট ছোট শহর থেকেও প্রকাশিত হয় একাধিক পত্রিকা, স্থানীয় চায়ের দোকানের টেবল সরগরম করে রাখে এক-একটি নবীন সাহিত্যগোষ্ঠী, পৃথিবীর আর-কোনো দেশে এমন সাহিত্যচাঞ্চল্য রয়েছে কিনা জানি না, নেই বলেই দৃঢ় বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। না, পৃথিবীর অন্তত আর একটি দেশে এরকম আছে, আমি স্বচক্ষেই তো দেখেছি, তবে সৌভাগ্যের বিষয়, সেটিও বাংলাভাষী দেশ, আমদের প্রতিবেশী বাংলাদেশ।

সব লিট্‌ল ম্যাগাজিনেই থাকে আগেকার সাহিত্যের প্রতি তাচ্ছিল্য, ভেঙে চুরে-গুঁড়িয়ে দেবার বাসনা এবং এস্টাব্লিশমেণ্ট-বিরোধিতার সুর। এটাই স্বাভাবিক। আগেকার সাহিত্য থেকে অন্তত দু-এক পা এগোতে না পারলে আর নতুন পত্রিকা বার করা কেন? তার জন্য অবশ্য আগেকার সাহিত্য খুব ভালো করে পড়ে দেখা দরকার। অল্প বয়েসে বাথরুমে বসে হঠাৎ মাথায় এক একটা চিন্তা আসে আর মনে হয়, এরকম আগে কেউ ভাবেনি। এই আত্ম-শ্লাঘার এক লক্ষের মধ্যে মাত্র দু-একটিই সত্য, সেই জন্যই তো বিশ্বে নব-নব আবিষ্কার হচ্ছে। আর বাকি নিরানব্বই হাজার নশো নিরানব্বই জন জানেই না বা ঠিক ঐ এক চিন্তা ওর চেয়েও বেশি সংখ্যক মানুষের মস্তিষ্কে আগে এসেছে, তারা লিখে কিম্বা হাতে-কলমে প্রমাণ দিয়ে গেছে। সুতরাং সত্যিকারের নতুন চিন্তার জন্য আগেকার সমস্ত প্রকাশিত চিন্তাগুলি জানতে হয়। এই না-জানার পরিচয় বহনকারী পত্রিকাগুলিকে লিট্‌ল ম্যাগাজিন আখ্যা দেওয়া যায় না। এজন্য এই সব পত্রিকার সম্পাদকদেরও দায়িত্ব অনেকখানি। একই পত্রিকায় দুটি বেশ তারতাজা রচনার পাশে দু-চারটি পচা গন্ধ মাখা রচনা দেখতে পেলে সেই পত্রিকার জাত সম্পর্কে সংশয় জাগে। অনেকেই লেখে কিন্তু তারা লেখক হবার জন্য আসে না। সেইজন্যই প্রত্যেক নতুন লেখককে কোনো এক সময় একলা নিজের ঘরের সাদা দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করা উচিত, আমি কি সত্যিই লিখতে চাই?

আমাদের দেশের গ্রুপ থিয়েটারগুলির নিয়তি এই যে দু-চার বছরের মধ্যেই একটি দল ভেঙে দু' টুকরো হয়, তারপর চার টুকরো। সম্ভবত এর কারণ শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রেতাত্মা। এক উদ্যানে একটিই বনস্পতি থাকতে হবে এমন কোনো মানে নেই। লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলির মধ্যেও এরকম ভাঙার প্রবণতা আছে, কিন্তু সেখানে তো ওরকম কোনো প্রেতাত্মার উপদ্রব

থাকবার কথা নয়। এই সব পত্রিকার সম্পাদকের কাজ বরং দূর-দূরান্ত থেকে সমধর্মী লেখক খুঁজে এনে দল ভারী করা।

লিট্‌ল ম্যাগাজিন খুব দীর্ঘায়ু হোক, এমন কেউ দাবি করে না। বুদ্ধদেব বসু সীমারেখা বেঁধে দিয়েছিলেন পঁচিশ বছর। 'কবিতা' পত্রিকা তারপর নানা চেষ্টা সত্ত্বেও টেঁকেনি। সেইজন্যই সম্ভবত পঁচিশ-বছর বয়স পেরুবার পর 'কৃত্তিবাস' পত্রিকারও চরিত্রের বদল কিম্বা কারুর কারুর মতে অধঃপতন ঘটেছে। তবে মাত্র দু-এক বছর বেরুলে ঠিক কোনো দাগ থাকে না। সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের বাংলা ভাষায় এখন বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা অকালমৃত্যু পেরিয়ে এগিয়ে চলতে পারছে। যেমন, অনিয়মিত হলেও 'এক্ষণ', 'কবিপত্র', 'গন্ধোত্রী', 'সমতট', 'সমকালীন কলকাতা', 'একক' 'ধ্রুপদী' — আরো অনেক কাগজ যাদের নাম এই মুহূর্তে মনে আসছে না।

কোনো লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে পুরস্কার দেবার চিন্তা এ পর্যন্ত আর কারুর মস্তিষ্কে আসেনি, এজন্য 'বিভাব' পত্রিকার সম্পাদক, আমাদের বন্ধু সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের প্রতি মৌখিক সমবেদনা অনেকেই জানান, কিন্তু সত্যিকারের এরকম সুফলপ্রদ সাহায্য আগে আর কেউ করেননি। এবং পুরস্কারটির সঙ্গে দিলীপ কুমার গুপ্তের স্মৃতি জড়িত হওয়ায় এর মূল্য আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রবন্ধ

গ্রহণ বর্জন পালা

অরুণ মিত্র

সাহিত্যে, শিল্পে ও সংগীতে খ্যাতি আর খ্যাতিহীনতার অথবা কখনো অখ্যাতির যে-রদবদল চলতে থাকে, তা প্রায় ম্যাজিক-দৃশ্যের মতো। আমীর হয়ে যান ফকির এবং ফকির আমীর। কিন্তু 'কী মজা' বলতে গিয়ে আমরা থমকে যাই, বুঝতে পারি কৌতুকের মধ্যে মিশে রয়েছে ট্র্যাজিডি। কেননা খেলাটা অযথা সমাদর এবং অযথা অবহেলা দিয়ে তৈরি। খ্যাতি লাভ ক'রে যাঁরা বিস্মৃতি-সমুদ্রে তলিয়ে যান, ধীরে ধীরে অথবা দ্রুত, তাঁরাই অবশ্য সংখ্যাধিক, কিন্তু অবহেলা থেকে সমাদরে যাঁরা উঠে আসেন, তারা সংখ্যায় অল্প হলেও অবস্থার তীব্রতা তাঁদের ক্ষেত্রেই বেশি, অনেক বেশি। তবে উভয় ক্ষেত্রেই নিহিত থাকে ভাগ্যবিড়ম্বনা। আবার ব্যতিক্রমের মতো গ্রহণ-বর্জন-পুনর্গ্রহণ, এমন এক চক্রও কোনো বিরল মুহূর্তে ঘুরে যায়। এই মজাদার শোচনীয় পালাটা চলে সময়ের মঞ্চে, যা আয়তনে কখনো ছোট হয়, কখনো বা বড়।

যে-সব দেশে সাহিত্য, শিল্প ও সংগীতের ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে ব'য়ে এসেছে, সেখানেই এই ওলটপালটটা স্পষ্ট ধরা যায়। মোৎসার্ট আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতস্রষ্টা হিসেবে বন্দিত। পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে তাঁর সৃষ্টি পরিমাণে ও স্বকীয়তায় বিস্ময়কর। কিন্তু যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি ক্রমাগত বাধাই পেয়েছেন, কোনো স্থায়ী কাজ পান নি এবং শরীর ভেঙে পড়ায় যখন তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে তখন তাঁকে মাটি চাপা দেওয়া হয় বিত্তহীনের কবরে। আর সেজান? আধুনিক চিত্রকলার বিরাট পুরুষ, নতুন শিল্পভাবনার অসাধারণ রূপকার সেজান? সারা জীবন তিনি কেবল বিড়ম্বিতই হয়েছেন। সরকারী

প্রদর্শনকক্ষে ছবি রাখার অনুমতি তাঁকে কখনো দেওয়া হয় নি, যদিও আজ তাঁর ছবি লুভর্‌ মিউজিয়মের এক সম্পদ; তাঁর ছবির ক্রেতা জোটে নি কখনো, শেষ পর্যন্ত দোকানীর নীলামে তাঁর ছয়খানি ছবির দামের অঙ্ক হয়েছিল ৯৫ থেকে ২১৫ ফ্রাঁ পর্যন্ত যাদের প্রত্যেকটির মূল্য এখন লক্ষ লক্ষ ডলার। এই অবস্থার কথা ভাবলে বিমূঢ় হতে হয়।

এই গ্রহণ বর্জনের ব্যাপারটা সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক সাহিত্যের রাজ্যে। কীটস্‌-এর অদৃষ্টে তাঁর জীবনকালে যে-ঔদাসীন্য ও বিরুদ্ধতা হয়েছিল তা অনেকেই অবগত আছেন। কেউ কেউ বলেন সেইজন্যেই তাঁর অকালমৃত্যু হয়। তা হয়তো ঠিক নয়, কিন্তু সেই সংবেদনশীল মন ঐ আঘাতে যে ক্লিষ্ট হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। অথচ এই কীট্‌সকে পরে ইংরেজীকাব্যে সমসাময়িক মহৎদের মধ্যে মহত্তম বলে স্বীকার করা হয়েছে। কীটস্‌-এর কবিতা Ode to Me'ancholy-র মধ্যে যে ফরাসী কবির কাব্যের কিছু পূর্বস্বাদ পাওয়া যায় সেই বোদলেরই বা কতটা গৃহীত হন তাঁর সময়ে? এটা ঠিক যে তিনি যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, কিন্তু তা তাঁর কাব্যসংক্রান্ত অন্য কারণে। তাঁর উপর সকলের নজর পড়েছিল যেহেতু তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থ Les Fleurs du Mal-এর জন্যে অশ্লীলতার দায়ে আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। সাধারণভাবে প্রকাশকরা তাঁর প্রতি বিমুখ ছিলেন। একমাত্র পুলে-মালাসিস, যিনি ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় অবিচল ছিলেন। অবশ্য ঐ আদর্শবাদী প্রকাশকের ব্যবসা শেষ পর্যন্ত লাটে উঠেছিল এবং তিনি আত্মগোপন করেছিলেন বেলজিয়ামে। ভিকতর য়ুগো এবং আরো কোনো কোনো কবি তাঁর প্রতিভা স্বীকার করলেও বোদলের যে বেশি পাঠক পান নি তা অনুমান করতে অসুবিধে হয় না। পৃথিবীর সর্বত্র আজ তাঁর কাব্যের অগণিত পাঠক, কিন্তু তাঁর সমকালে তাঁর স্বদেশে ছিল কতজন? এ সম্বন্ধে বোদলের নিজে যে শ্লেষোক্তি করেছেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে। আদালত তার রায়ে বোদলের ও পুলে মালাসিসকে জরিমানা করেছিল এবং Les Fleurs du Mal-এর কিছু কবিতা বাতিল করার হুকুম দিয়েছিল। সেই বর্জিত কবিতা কয়টির (সংখ্যায় ছয়) সঙ্গে আরো কিছু কবিতা যোগ ক'রে পুলে মালাসিস গোপনে বেলজিয়ামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন Les Epaves নামে। তাতে প্রকাশকের ক্ষুদ্র নিবেদনটি লিখে দেন স্বয়ং বোদলের। তার শেষাংশটি এই: "এই প্রকাশনার সংবাদ গ্রন্থকারকে জানানো হবে

এবং সেই সঙ্গে জানানো হবে সম্ভাব্য দুই শ ষাটজন পাঠককে। যখন থেকে জন্তুরা সন্দেহাতীতভাবে মানুষের বাক্য আত্মসাৎ করেছে তখন থেকে ফ্রান্সে সাহিত্যানুরাগী জনসাধারণ বলতে মোটামুটি ঐ দুইশ ষাট জনকেই বোঝায়।" মালার্মের পাঠক সংখ্যা খুবই সীমিত ছিল। মনে হয়, শেষ পর্যন্ত প্যারিসের রোম সরণিতে তাঁর বাসগৃহে মঙ্গলবারের সাপ্তাহিক বৈঠকে যে গুণমুগ্ধরা জড়ো হতেন, তাঁরাই ছিলেন তাঁর প্রধান পাঠক। তাঁদের বাদ দিলে তাঁর কবিতা পড়বার লোক আর কতজন ছিল তা অনুবীক্ষণ-পরীক্ষার বিষয়। এই প্রসঙ্গে মালার্মের রচনা প্রত্যাখ্যানের ঘটনাটা উল্লেখযোগ্য। তাঁর কবি জীবনের প্রথম দিকে Le Panasse contemporain নামে তখনকার নব কাব্যের সংকলন বের হয় ক্রমান্বয়ে তিনটি। প্রথম দুটি সংকলনে মালার্মের কবিতা ছিল, কিন্তু তৃতীয় সংকলনে তাঁকে বর্জন করা হয়। এ সংকলনটি সম্পাদনা করেছিলেন আনাতল ফ্রাঁস। আবার অন্য দিকের এক বিশেষ দৃষ্টান্ত স্যুলি-প্রুদম। তাঁর কাব্যের জন্যে ১৯০১ সালে নোবেল প্রাইজ পান এই ফরাসী ভদ্রলোক—সাহিত্যে প্রথম নোবেল লরিয়েট। তাঁর কবিতা পড়া দূরে থাক, তাঁর নামটাই বা কজন জানে আজ? হায় নোবেল!

আমীর-ফকির নাটকের সবচেয়ে বিস্ময়কর নায়ক বোধ হয় পিয়ের দ্য রঁসার। ষোড়শ শতকে 'প্লেইয়াদ' গোষ্ঠীর নেতা এই ফরাসী কবি তাঁর জীবনকালে অতুল খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করেন। শুধু ফ্রান্স নয়, সারা ইয়োরোপ তাঁকে কবিশ্রেষ্ঠ রূপে বরণ করে। কিন্তু সপ্তদশ শতকের আরম্ভেই তাঁর প্রতি সবাই বিরূপ হয়ে যায়। এবং দুই শতাব্দীর অধিককাল তিনি বিস্মৃত হয়ে থাকেন। মাত্র গত শতাব্দীতে প্রভাবশালী রোমান্টিক লেখকরা সেই বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে তাঁকে উদ্ধার করে আবার তাঁর সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সমাদর ও অবহেলার এই অন্তহীন পালা আমাদের আরো আশ্চর্য করে এই কারণে যে, এরই সঙ্গে দেখা যায় বহু মহৎ প্রতিভা স্বকালেই স্বীকৃত হয়েছেন এবং সে স্বীকৃতি আর প্রত্যাহৃত হয় নি। তাহলে ওলটপালটটা কেন ঘটে? আমার বিশ্বাস, সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও পর্যালোচনাই শুধু এ রহস্যের কিনারা করতে পারে। রঁসারের ক্ষেত্রে সেটা নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত সহজ। বলা যায়, সতেরো ও আঠারো শতকের ক্লাসিক আদর্শ, সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান, নৈর্ব্যক্তিক সত্যসন্ধান এবং যুক্তিবাদ রঁসার-যুগের

ব্যক্তিগত আবেগ ও নিসর্গ-অনুভূতি থেকে মানুষের মনকে সরিয়ে দিয়েছিল এবং উনিশ শতকে রোমান্টিকরা আবার তা ফিরিয়ে আনেন। তাই এই উত্থান পতন পুনরুত্থান। মহত্তের সুস্থির স্বীকৃতির ক্ষেত্রে হয়তো একথা বলা যায় যে, কোনো কোনো প্রতিভার বহুকোণ বিকিরণে এমন কিছু রশ্মি থাকে যা মানুষের গতানুগতিক মনকেও স্পর্শ করে, সুতরাং সে প্রতিভার পূর্ণ উপলব্ধি ভবিষ্যতের জন্যে জমা থাকলেও সমসাময়িক কাল তাকে স্বীকার করে নেয়। এ ছাড়া, সাধারণভাবে বোধ হয় এটুকু বলা যায় যে, নতুন ভাব বা ভাবনা এবং নতুন বাক্‌ভঙ্গি সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ সমসাময়িক অভ্যাসে ঠিকমতো ধরা পড়ে না, ফলে স্বীকৃতির জন্যে তাদের অপেক্ষা করতে হয়। সমসাময়িক সমাদরের ঘটা এই মানসিক অবস্থারই আর এক দিক। যে রীতিপদ্ধতি এবং চিন্তার গতির সঙ্গে মানুষ পরিচিত, এমন কি তা যদি যান্ত্রিক হয়ে দাঁড়ায় তবুও, তাকে অভ্যর্থনা করতে তার বাধে না, যে কারণে তুচ্ছও মহতের মর্যাদা পেয়ে যায়। বর্তমানকালে এই শোচনীয়তা আরো বিস্তৃত হয়েছে, কেননা মানুষের সাহিত্য-কৌতূহলী মনের পরিচালনায় নেমেছে প্রচারযন্ত্রের ক্ষমতা। এই বিভ্রান্তির আর এক উৎস শিল্পবোধহীন পণ্ডিতী আলোচনা, যা সাধারণত গতানুগতিকতারই এক গুরুগম্ভীর প্রকাশ। এ বিষয়ে নতুন করে কিছু না বললেও চলে। ইতিপূর্বে, বিশেষত উনিশ শতকের ফ্রান্সে তুমুল বাদানুবাদ হয়েছে এ নিয়ে। বোদলের প্রমুখ অনেক কবি-সাহিত্যিক, প্রধানত নব কাব্যের যাঁরা শরিক তাঁরা, এই সাহিত্য-সমালোচনার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ জানিয়ে গিয়েছেন। এ সব বলার পরও কিন্তু রহস্য কিছু থেকেই যায়। গ্রহণ বর্জনের আসল কারণ সব ক্ষেত্রে সঠিক বোঝা যায় না। সেজন্যে বোধ হয় আরো গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। নাকি আমার এক কবি-বন্ধুর মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে শেষ পর্যন্ত বলতে হবে: "সবই কপাল, বুঝলেন, কপাল"।

এই অবস্থার হাস্যকরতা উপলব্ধি করেই, মনে হয়, বহু প্রতিভাবান স্রষ্টা খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে মুখ একেবারে ঘুরিয়ে নেন। বিশেষ করে ফ্রান্সের লেখকদের মধ্যে তার প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন বোদলের, মালার্মে, ভালেরি, সার্ত্র এবং আরো অনেকে। তাঁদের এই মনোভাব বিশদ আলোচনার যোগ্য। এ প্রসঙ্গে আমার শুধু বারবার মনে ভেসে ওঠে র‍্যাঁবোর এক চলমান ছবি। মা'র বাড়ি রশ থেকে তিনি চলেছেন মার্সেইতে।

অনেক বছর ধরে আফ্রিকা ও এশিয়া পর্যটনের পর এ তাঁর অন্তিম ভ্রমণ। মার্সেই-এর হাসপাতাল তাঁর গন্তব্য। প্যারিসের এক স্টেশনে নেমে শহরের মাঝখান দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে তিনি চলেছেন আর এক স্টেশনে ট্রেন ধরতে। গাড়ির জানলা দিয়ে চুপচাপ তাকিয়ে ছিলেন সেই রোগজর্জর সাঁইত্রিশ বছরের যুবক, যিনি উনিশ বছর বয়সে কবিতাকে বিসর্জন দিয়েছেন। সেদিন প্যারিসের কেউ জানতে পারে নি কে গেল রাস্তা দিয়ে, অথচ সেই মুহূর্তে প্যারিসের তথা ফ্রান্সের সমগ্র সাহিত্য জগৎ তাঁর নামে আলোড়িত, তাঁর প্রতিভার কীর্তনে মুখর, তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্যে উদগ্রীব। তাঁর নিঃশব্দ অলক্ষিত গমনের পথে তার মৃদুতম রেশও তিনি শোনেন নি, শুনতে চানও নি। তিনি তার আগেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন শুধু খ্যাতির দিক থেকেই নয়, কাব্যসাহিত্যের দিক থেকেও। অবশ্য এ বিদায় অন্য এক স্তরে, তবু সাহিত্যের সঙ্গে জড়ানো খ্যাতি সমাদরের বন্ধন ছিন্ন করা তো বটে।

তবে এইসব লেখক ব্যক্তিগত গৌরবের প্রতি উদাসীন হয়েও অবশেষে গৌরবের শিখরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কী বৈপরীত্য! কী অপরূপতা!

গ্রহের চক্রান্ত

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

'চতুরঙ্গ' পত্রিকার কার্তিক-পৌষ ১৩৮৮ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে ক্ষিতিমোহন সেনের একটি প্রতিভাষণ যেটি তিনি পাঠ করেছিলেন ১৩৫৯ সালে ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে। সেখানে একটি অশ্রুতপূর্ব তথ্য পাওয়া গেল। তথ্যটি এই :

'১৯১৩ সালে গুরুদেব নোবেল পুরস্কার পেলেন। তখন কথা উঠল গীতাঞ্জলি অভারতীয়। ওর সব চিন্তা ইয়োরোপের কাছেই ধার করা। আমাদের দেশের সমালোচকরা প্রথমে তো রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে ভালো বলে স্বীকারই করেন নি। কেউ বলেছেন, "ওসব ন্যাকামি।" তবু যখন তাঁর কাব্যের পসার ঘটেছে তখন বলেছেন, "ওসব বিলিতী জিনিস।" একদল খৃষ্টীয় মিশনারী এই কথার জোরে গীতাঞ্জলির মূলে খৃষ্টীয় সাহিত্য বলেই দাবী করলেন। বাধ্য হয়ে গুরুদেব পাঁচ শ বছর পূর্বেকার কবির-বাণী ইংরিজীতে প্রকাশ করলেন। দেশেবিদেশে তার প্রভূত সমাদর হল।'

তথ্যটি সত্য বলে গ্রহণ করার পথে বাধা আছে। কিন্তু ক্ষিতিমোহন সেন রবীন্দ্রনাথ-কৃত সন্ত কবি কবীরের অনুবাদ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলে মনে করা হয়, অতএব তথ্যটি বিচার করা যাক।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে আমাদের জানিয়েছেন, কবির অনুবাদ সংক্রান্ত কিছু খবর। সেগুলো এই—

হিন্দি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে ক্ষিতিমোহন সেন ৩৪৩টি কবীর দোঁহা প্রকাশ করেন ১৯১০-১১ সালে। এই দোঁহাগুলি থেকে কিছু নিয়ে অজিত কুমার চক্রবর্তী ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই অনুবাদ 'সামান্য অদলবদল' করেন এবং প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। পুস্তকটির ভূমিকা লেখেন এডলীন আণ্ডারহিল এবং ভূমিকায় অজিতকুমারের রচনার উল্লেখ করেন। রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি প্রভাতকুমার এই প্রসঙ্গে মনে করেছেন। 'রোটেন-স্টাইন বলেন, আমার তর্জমার নীচেই তোমার তর্জমা তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগে। ইংরেজি তর্জমায় তোমাকে ছাড়াবার অভিপ্রায় আমার কোনোদিন ছিল না— এবং ছাড়িয়েছি বলে কোনোদিন কল্পনাও করিনি— গ্রহের চক্রান্তে গোলমালে কোনদিন কেমন করে ঘটে গেছে তা জানি নে— অতএব এতে

আমার কোনো দোষ নেই।' প্রভাতকুমারের অনুমান, চিঠিটি লেখা হয়েছে সেপ্টেম্বর ১৯১২।

প্রভাতকুমারের লেখার ভঙ্গিতে একটি রহস্যের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কবির অনুবাদ প্রসঙ্গে এই চিঠি কেন? রবীন্দ্রনাথই বা কী বলতে চাইছেন? গ্রহের চক্রান্ত, গোলমাল, এসবের অর্থ কী? চিঠিটির সময় যা অনুমান করা হয়েছে, তা-ই বা কি ঠিক?

১৩৮৮ দেশ সাহিত্য সংখ্যায় অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি ছাপা হয়েছিল। তার মধ্যে প্রাসঙ্গিক চিঠির অংশগুলো স্মরণ করা যাক।

২১ জুলাই, ১৯১৫ : কবির গ্রন্থ সম্বন্ধে তুমি একটু ভুল বুঝেচ। প্রথমত গ্রন্থ থেকে তোমার নাম বাদ দেওয়া হবে Evelyn Underhill এমন ইচ্ছা করেন না। দ্বিতীয়ত আর্থিক হিসাবে তোমাকে ও ক্ষিতিমোহনবাবুকে যে বঞ্চিত করা হবে এমন ইচ্ছাও আমার নয়। সম্ভবত E. Underhill কিছুই নেবেন না। কিম্বা ১৫/২০ পাউণ্ড একযোগে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন। তারপরে জানই ত আমি কিছুই নেব না। কেবল আমার নাম ও কাজের পরিবর্তে যে মূল্য পাওয়া যাবে তা আমি বিদ্যালয়কেই দেব এবং সেইসঙ্গে তোমাদের দুজনকেও স্মরণ করব। একথা আগে থাকতে বলবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু বলে রাখাই ভাল। এক কাজ করব। Macmillan-দের লিখে দেব এ সম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে কোনোভাবে একটা কিছু কথাবার্তা তারা ঠিক করে নেবে।

এটা অবশ্য ম্যাকমিলান প্রকাশিত গ্রন্থ, Songs of Kabir, সম্পর্কে। ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রকাশিত One Hundreds Poem of Kabir-এর নতুন সংস্করণ এটি, প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে। ইণ্ডিয়া সোসাইটির সংস্করণটি প্রকাশ হয়েছিল আগের বছর ১৯১৪ সালে। ১৯১৩ সালে অজিতকুমারকে লেখা চিঠিগুলোর তারিখ পাওয়া যায় নি, পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় আভ্যন্তরীণ তথ্যের সাহায্যে নামগুলো অনুধান করে নিয়েছেন। অনুমানগুলো সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ বলা যাচ্ছে না, তবে সেই অনুমান অনুযায়ী চিঠিগুলোর অংশ :

আগস্ট ১৯১৩ :

আজকের ডাকে তোমার কবিরের সূচীপত্র পাওয়া গেল কিন্তু আমি ইতিমধ্যে আমার কাজ সমাধা করে ফেলেছি। Mrs Stuart Moore-এর সংশোধিত পাণ্ডুলিপিটি আছে তিনি সমস্তটা স্বহস্তে কপি করে টাইপ করবার

জন্যে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। তারপর ছাপবার বন্দোবস্ত করতে হবে। প্রুফ যখন তৈরী হবে তখন দেখবার জন্যে তোমাদের পাঠাতে বলব। তোমার ভূমিকাটি পেলে কাজে লাগবে।

জুন-জুলাই (?) ১৯১৩ :

তোমার কবির এতদিনে শেষ করেছি। আমি যদি নিজে আগাগোড়া তর্জমা করতুম তাহলে এর চেয়ে অনেক কম পরিশ্রম করতে হত। অনেক কবিতাই আমাকে প্রায় পনের আনাই লিখতে হয়েছে অথচ তালি দেওয়ার ভার হয়ে গেছে। আসল কথা, এ সমস্ত কবিতা অনুবাদ করতে হলে যথাসম্ভব মূলের অনুবর্তন করা দরকার ও বাদ সাদ দিয়ে কেবলমাত্র ভার রক্ষা করে করা চলে না। বিশেষত এ দেশের পাঠকরা যদি একবার জানতে পারে এই কবিতাগুলি অবিকল অনুবাদ নয় তাহলে এরা তাকে একেবারে পরিহার করবে। কেননা এখানকার যারা ভারতের সাধকদের সঠিক অনুশীলন করতে চায় তারা খাঁটি খবরটি চায়— তারা ত কেবলমাত্র ভাল কবিতা পড়তে চায় না। যা হোক আমার যতদূর সাধ্য আমি ওর অপূর্ণতা দূর করেছি। India Society এই কবিতাগুলি বের করবে কিনা এখনো তার নিশ্চিত খবর পাই নি— করবে বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু ওরা যদি বের না করে তাহলে সম্ভবতঃ Macmillan প্রকাশ করতে ইচ্ছুক হবে। সে হলে মোটের উপর ভালই হয়। কেন না India Society-র প্রসার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। তোমার এ বইয়ে অর্থলাভের সম্ভাবনা কতদূর তা বলতে পারি নে। অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না কিন্তু বেশি আশা কোরো না। যা পাও তাই যথেষ্ট। কেননা এ জিনিষের উপর তোমার দাবীও অল্প কারণ এর ভিত্তিতে ক্ষিতিমোহনবাবু আছেন, এখানকার ব্যবসায়ের নিয়মে একটা মোটা প্রাপ্য তাঁরই। কবির তিনি যে কেবল সংগ্রহ করেছেন তা নয় তাঁর অনুবাদ অবলম্বন করেই এই অনুবাদগুলি রচিত— যথার্থ পরিশ্রমই যে তাঁরই— বস্তুত এখানকার Publisher-দের সঙ্গে যখন agreement হবে তখন তারা গোড়ায় জিজ্ঞাসা করবে এতে অন্য কারো ন্যায্য দাবী আছে কিনা— সে সমস্ত দাবীর জন্যে তারা দায়িক হতে স্বীকার করবেই না।

জুলাই (?) ১৯১৩ :

তোমার কবির নিয়ে পড়েছি। খাটতে হচ্ছে কম নয়। খুঁজে বের করতেই কত সময় যাচ্ছে তার ঠিক নেই। তারপর তুমি যেসব লাইন বাদ

দিয়েছ সে সমস্ত আমাকে বসিয়ে দিতে হচ্ছে। তার উপরে আমার বোধ হচ্ছে তোমার তর্জমার উপরে পিয়ার্সনের "স্থূল হস্তাবলেপন" পড়ে অনেক জায়গায় বিপরীত রকমের prosaic হয়ে পড়েছে। এক একটা তর্জমা আগাগোড়া নতুন করে লিখতে হয়েছে। প্রথমের দিকে গোটাকতক লেখা তত বেশি বদলাতে হয়নি। কিন্তু যতই অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে ততই খাটুনি বেড়ে চলেছে। যাই হোক এটা India Society থেকে প্রকাশ হওয়া স্থির হয়েছে অতএব আশা করচি, এর থেকে তুমি কিছু টাকা পেতে পারবে।

জুন (?) ১৯১৩ :

India Society-এর সভায় স্থির হয়ে গেছে তোমার কবিরের তর্জমা তাঁরা ছাপবেন। এটা তোমার পক্ষে খুব ভাল হল। আমি তোমার লেখা মূলের সঙ্গে মিলিয়ে কতকটা সংশোধন করে দেবার চেষ্টা করচি। প্রথম ৪০টা খুঁজে পেয়েছি তারপরে এমন উল্টোপাল্টা করে রেখেছ যে বের করতে সময় লাগবে বলে কাজ বন্ধ আছে। মেরি প্রভৃতি সুন্দর শব্দকে ইংরেজি metaphysical 'Ego' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা তর্জমা করাতে সেগুলো গদ্য-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে— সাধককে এক জায়গায় Spiritual aspirant করেছ কবিতায় এ একেবারেই অচল। এইগুলো যথাসম্ভব মেজে ঘসে দিতে হবে। মূলের পত্রাঙ্ক যদি দিয়ে দিতে তাহলে এতদিনে কাজ হয়ে যেত। রোটেনস্টাইন বলচেন কবিরের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করে যত শীঘ্র পার একটা ভূমিকা লিখে পাঠিয়ো। কবিরের সম্বন্ধে পাদ্রির লেখা একটা ইংরাজি বই ক্ষিতিমোহনবাবুকে দিয়েছিলুম, সেইটে থেকে ওঁর জীবনকালের যেটুকু ইতিবৃত্ত পাও ভূমিকায় জুড়ে দিও— ইতিহাস অংশ খুব বিস্তারিত হবার দরকার নেই। বেশি দেরি কোরো না, তাহলে আগামী শরৎঋতুতে অর্থাৎ অক্টোবরের মধ্যে বেরুতে পারবে না।

মে-জুন (?) ১৯১৩ :

কবির সম্বন্ধে তোমার প্রবন্ধটি পেয়েছি। আমার ভালই লেগেছে এবং পড়েই আমি Mrs Stuart Moore-কে (E. Underhill) পাঠিয়ে দিয়েছি। তিনি এই বইয়ের একটা ভূমিকা লিখবেন তাই তাঁর পক্ষে এ লেখা আবশ্যক হবে—এর জন্যেই এতদিন অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর ভূমিকাসুদ্ধ বের হলে এ বইয়ের আদর হবে— এই জন্যে একটু দেরি হলেও সেটা স্বীকার করতে হবে। India Society-র ইচ্ছা ছিল আগামী অক্টোবরেই বের করে দেন

কিন্তু বোধহয় তার সময় হবে না। India Society যদি একে নিষ্কৃতি দিতেন তাহলে আমি ম্যাকমিলানদের দিয়ে বের করতে পারতুম কিন্তু তাঁরা বোধহয় সহজে ছাড়বেন না। প্রথমটা ওঁদের যথেষ্ট দ্বিধা ছিল। সেই জন্যে আমি আশা করেছিলুম ওঁরা হয়ত ছুটি দেবেন। কিন্তু আমি সংশোধন করতে প্রবৃত্ত হয়েছি শুনে ওঁরা মত বদলেছেন। কিন্তু সংশোধিত পাণ্ডুলিপি এখনো তাঁদের হস্তগত হয় নি সেইজন্য তাঁরা কিছু অস্থির হয়ে উঠেছেন। বোধহয় সেটা যথারীতি পুনর্বার একবার কমিটির হাতে গিয়ে তাদের সম্মতি লাভ করলে তবে প্রকাশের আয়োজন হবে। কি হয় দেখা যাক। যাই হোক না এ বইয়ের প্রকাশকের অভাব হবে না।

এই চিঠিগুলির কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরে এ বিষয়ে পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুমান সন্দেহাতীত না হলেও, এটা স্পষ্ট যে কবিরের তর্জমার কাজ শুরু হয়েছে ১৯১৩ মে মাসের বহু আগেই। মে মাস নাগাদ রবীন্দ্রনাথ তর্জমার সংশোধনে হাত দেন। তার আগেই অজিতকুমার তাঁর তর্জমা আণ্ডারহিলের কাছে পাঠিয়েছিলেন গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য।

যে সময়ে কবিরের দোঁহার অনুবাদ চলছে তখন রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পান নি। অতএব তাঁর গীতাঞ্জলি অভারতীয়, খৃষ্টীয় মিশনারিদের এই অভিযোগ খণ্ডানোর জন্যই কবিরের অনুবাদের আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন সেনের এই ধারণা একেবারেই অসত্য। ১৯১৩ মে-জুনের আগে কেবল ইংরেজি গীতাঞ্জলিই প্রকাশিত হয়েছে। এই গীতাঞ্জলি থেকে রবীন্দ্রনাথ কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন ইংরেজ কবিদের ১৯১২ সালের ৭ এবং ১২ জুলাই। সেই কবিতা শোনার পর ইয়েটস বলেছিলেন, গীতাঞ্জলির সঙ্গে তুলনা করা যায় টমাস একেম্পিসের Imitation of Christ-এর, কিন্তু টমাস পাপ-বোধে পীড়িত, রবীন্দ্রনাথ প্রেমে উদ্বুদ্ধ। মে সিনক্লেয়ার বলেছিলেন, গীতাঞ্জলির প্রত্যয় খৃস্টান কবিদেরও ছাড়িয়ে গেছে।

গীতাঞ্জলির প্রকাশ হয় ১৯১২-এর শেষে, যখন রবীন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ড ছেড়ে আমেরিকায়। গীতাঞ্জলির আলোচনা পত্র-পত্রিকায় এর পর থেকে। 'টাইমস লিটরারি সাপ্লিমেণ্ট'-এ (৭ নভেম্বর ১৯১২) এডমাণ্ড গস, 'পোয়েট্রি' এবং আগের 'ফোর্টনাইটলি রিভিউ'তে (মার্চ ১৯১৩) এজরা পাউণ্ড, 'নেশন'-এ এডলীন

আণ্ডারহিল, 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে' লাসেল অ্যাবারকোম্বি যেসব সমালোচনা করেন, তার মূল সুর হলো, রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যদেশের মরমিয়া কবি। কোনো সমালোচকই বলেন নি রবীন্দ্রনাথ খৃষ্টীয় সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। বরং খৃষ্টীয় সাহিত্যের বাইরেও যে মিষ্টিক কবিতা আছে, এই আবিষ্কারেই তাঁরা সব বিস্মিত এবং বিমূঢ়।

ইণ্ডিয়া সোসাইটি 'ওয়ান হানড্রেড পোয়েমস অব কবির' প্রকাশ করে ১৯১৪ সালে। ম্যাকমিলান এর পুনর্মুদ্রণ করে ১৯১৫ সালে। এই প্রকাশের প্রতিক্রিয়ার দুটি দিক কৌতূহল উদ্রেক করে।

সুজিত মুখার্জি তাঁর Passage to America গ্রন্থে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় এক লেখিকার কথা বলেছেন, যিনি সন্দেহ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গুরু হলেন কবির। এমন কথাও শোনা গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথে মৌলিকতা কিছু নেই, গীতাঞ্জলির সবই কবিরের দোঁহা থেকে ধার করা। এবং রবীন্দ্রনাথ কেন যে কবিরের তর্জমা প্রকাশ করে তাঁর কাব্যের উৎস ফাঁস করে দিলেন, এমন আক্ষেপও করেছিলেন কেউ কেউ।

আর একটি দিক, প্রভাতকুমার উল্লেখ করেছেন তাঁর জীবনীগ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের তর্জমা বিদেশে আগ্রহের সঞ্চার করলেও, দেশে বিরূপ সমালোচনার বিষয় হয়েছিল। ক্ষিতিমোহন সেনের হিন্দি থেকে বাংলায় অনুবাদ এবং অজিত চক্রবর্তীর সেই বাংলা অনুবাদের ইংরেজি অনুবাদ এবং তার উপর রবীন্দ্রনাথের সংশোধনের ফলে, কবির বিকৃত হয়ে গেছেন। এর মধ্যে পাঁচটি মূল কবির আছেন। এমন কথা বলেছেন পণ্ডিতেরা, ক্ষিতিমোহন সেনের অনুবাদের মধ্যেও (৩৪১টি দোঁহা) ১৮টি দোঁহায় কবির আছেন, বাকি সব প্রক্ষিপ্ত। মনে করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ এই বিকৃতি যাতে না হয় সে বিষয়ে সতর্ক ছিলেন, অজিতকুমারকে লিখেছেনও, কিন্তু বিকৃতির অনুযোগ এড়াতে পারেন নি। রবার্ট ব্রিজেস ১৯১৫ সালেই এইচ. এস. সুরাবর্দীর সাহায্যে মূলানুগ কবির তর্জমায় উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের কাব্য নিয়ে আলোচনা সর্বত্রই হয়েছিল, সব ধরনেরই। তার মধ্যে কিছু পাঠক রবীন্দ্রনাথে খ্রীষ্টীয় প্রভাব অবশ্যই লক্ষ্য করেছিলেন। অ্যারনসন তাঁর Rabindranath through Western Eyes গ্রন্থে তার কিছু উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার কোনোটিই ১৯১৩-এর মে-জুন মাসের আগে নয়। একমাত্র এজরা পাউণ্ড তাঁর

'ফোর্টনাইটলি রিভিউ'তে এ বিষয়ে বাইবেলের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন গীতাঞ্জলির, ১৯১৩ মার্চে। কবিরের তর্জমার কাজ তার আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

অজিতকুমারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির আর-একটি কৌতূহলোদ্দীপক দিক হলো, রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়া লিখে যাচ্ছেন, 'তোমার কবির'। ইণ্ডিয়া সোসাইটির গ্রন্থে এবং পরে ম্যাকমিলান সংস্করণেও কিন্তু অজিতকুমার চক্রবর্তীর নাম অনুবাদক বলে দেওয়া হল না, থাকল রবীন্দ্রনাথের নাম। সহায়ক এভলীন আণ্ডারহিল। অজিতকুমার উল্লিখিত হলেন শুধু আণ্ডারহিলের ভূমিকায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিগুলোতে বলেওছিলেন, কবিরের তর্জমার মূল কৃতিত্ব ক্ষিতিমোহন সেনের, অজিতকুমারের অনুবাদও সামান্যই রক্ষিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ প্রায় সমস্তটাই নতুন করে লিখেছেন। অতএব, এ বিষয়ে অজিতকুমারের প্রাপ্য, টাকায় বা নামে সামান্যই। রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা খুব সন্তোষজনক অবশ্য নয়। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের চিঠি বলে প্রভাতকুমার যা উল্লেখ করেছেন, যাতে আছে গ্রহের চক্রান্ত ও গোলমাল কথা দুটি, সেটা কি ১৯১২-এরই ?

কবিরের তর্জমার বিষয়ে রোটেনস্টাইনও অবহিত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর ১২ই জানুয়ারির (১৯১৫) চিঠিতে বলেছেন, কবির প্রকাশিত হলো, অজিত নিশ্চয় খুব খুশি হবে। কিন্তু প্রকাশ করাটা খুব সুসাধ্য হয়নি, তার প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথের বৈষয়িক বুদ্ধির অভাব।

গীতাঞ্জলির সাফল্যের পর কবির সম্পর্কেও কারো কোনো সন্দেহ ছিল না, এর সাহিত্যিক এবং বাণিজ্যিক সাফল্য নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের নিজের অবশ্য কোনো ধারণাই ছিল না। গীতাঞ্জলি তাঁর কয়েকজন গুণগ্রাহী ইংরেজ বন্ধুর উদ্যোগে ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রকাশ করেছিল প্রথম এবং তারপর ম্যাকমিলান প্রকাশ করে, কবিরও তাই। গীতাঞ্জলির সাফল্যের পর ম্যাকমিলান উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে কবির প্রকাশের জন্য। সেপ্টেম্বর ১৯১৩ এর মধ্যে রোটেনস্টাইন কবির-এর সংশোধিত তর্জমা হাতে পেয়ে গেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের কথামতো ইণ্ডিয়া সোসাইটি উদ্যোগী হয়েছে তার প্রকাশের জন্য। রোটেনস্টাইনের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথের বৈষয়িক নিরাপত্তার জন্য ফক্স স্ট্র্যাঙ্গওয়েজ এই প্রকাশের আর্থিক দিক দেখাশুনা করছেন। কিন্তু এভলীন আণ্ডারহিল জানাচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেন, কবির প্রকাশ করবে ম্যাকমিলান।

স্ট্র্যাঙ্গওয়েজ এতে বিভ্রান্ত। আণ্ডারহিলকে তিনি জানাচ্ছেন, ইণ্ডিয়া সোসাইটির সম্মতি ছাড়া ম্যাকমিলান যদি কবির ছাপে তাহলে সোসাইটি আণ্ডারহিলের সঙ্গেই মোকাবিলা করতে বাধ্য হবে। এদিকে ম্যাকমিলান কবির ছেপে ইংল্যাণ্ডে পাঠাতে যাচ্ছে, স্ট্র্যাঙ্গওয়েজ-এর ধমক খেয়ে সেটা পাঠানো বন্ধ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সোসাইটির প্রকাশিত অল্পসংখ্যক কবিরের বিক্রি শেষ না হয়। এইসব গণ্ডগোলেই, কবিরের প্রকাশ ১৯১৪ এর শেষে ইণ্ডিয়া সোসাইটির দায়িত্বে এবং ১৯১৫ এর প্রথমে ম্যাকমিলানের দায়িত্বে।

কবির প্রকাশের ব্যাপারে আণ্ডারহিলের ব্যবহার সম্পর্কে রোটেনস্টাইন বেশ বিরক্ত। তাঁর ভাষায়, বই লেখার সময় আণ্ডারহিল খুব মিষ্টিক, জীবনে কিন্তু খুবই ব্যবহারিক। গ্রন্থটিতে তাঁর নাম কীভাবে থাকবে সে বিষয়ে তিনি খুবই পরিষ্কার। অজিত চক্রবর্তীর অনুবাদ, রবীন্দ্রনাথের সংশোধন, অজিত চক্রবর্তীর ভূমিকার উপর নির্ভর করে আণ্ডারহিলের ভূমিকা— এইটুকু সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংশোধনের পর কি আণ্ডারহিল আবার সংশোধন করেছিলেন ? কতটুকু করেছিলেন সে বিষয়ে কোনো খবর নেই, এবং অনুবাদে সহায়ক বলে তাঁর নামই বেরুল, অজিতের কোনো উল্লেখ না করেই। বৈষয়িক দিক দিয়ে প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ। কতগুলো চিঠির উল্লেখ এ ব্যাপারে প্রয়োজন :

১। রবীন্দ্রনাথকে এভলীন (নভেম্বর ১৬,১৯১৩) : "...Our various shares in the production described on the title page ? I thought we might say that this version was based upon that of Ajit Kumar Chakrabarty. And do you wish anything said about him in the introduction ? and if so, what ?

২। রোটেনস্টাইনকে স্ট্র্যাঙ্গওয়েজ (এপ্রিল ১৯১৪) : K. M. Sen will be paid something via Tagore ; also A. Chakrabarty but I presume they will come into Mrs M's preface. What exercises me is ought we to pay Tagore anything for himself and if so what ? Our small (India Society) edition won't stand very much.

৩। ম্যাকমিলনকে রবীন্দ্রনাথ (ফেব্রুয়ারি ২৫,১৯১৪) : চিঠির সারমর্ম : He stated that the Bengali version, translated from Kabir's

Hindi, was K. M. Sen's and Ajit Chakrabarty used this as basis for his English version from which Tagore and Mrs Moore had worked. Tagore added that Ajit felt it inappropriate for his name to appear, as so little of his work remained. Tagore, however, asked Macmillan to tell the India Society that he wished all contributors to be credited.

৪। রবীন্দ্রনাথকে রোটেনস্টাইন (৮ অক্টোবর ১৯১৩): You and Mrs Moore have done wonders with Ajit's rather hurried work.

এইসব চিঠিগুলো আছে Imperfect Encounter গ্রন্থে। চিঠিগুলো থেকে স্পষ্ট যে অজিতকুমারের কবির-বিষয়ে ভূমিকা কীভাবে গ্রন্থটিতে লেখা হবে সেটা রবীন্দ্রনাথের জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছানুক্রমেই করা হয়েছে। তর্জমাতে অজিতকুমারের অংশ নগণ্য, টাইটেল-পেজ-এ অজিতকুমারের নাম দেওয়ার দরকার নেই, আণ্ডারহিলের ভূমিকাতে থাকলেই চলবে। এটাই হল রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা। এই ইচ্ছাতে অজিতকুমার খুব হৃষ্ট হন নি, সেটা বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের ২১ জুলাই ১৯১৫-এর চিঠিতে, 'কবির গ্রন্থ সম্বন্ধে তুমি একটু ভুল বুঝেচ।' ওই চিঠিরই শেষে 'এক কাজ করব। Macmillan-দের লিখে দেব এ সম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে কেজোভাবে একটা কিছু কথাবার্তা তারা ঠিক করে নেবে।' ম্যাকমিলানের সংস্করণ ১৯১৫-এর গোড়াতেই বেরিয়ে গেছে, 'নিউ ইয়র্ক টাইমসে' তার সমালোচনাও বেরিয়ে গেছে ফেব্রুয়ারি ১৪ তারিখে। তখন আর কথাবার্তা বলে লাভ?

রবীন্দ্রনাথ আদৌ কবির অনুবাদে উৎসাহী হন কেন, এই প্রশ্ন তুলে উত্তর দিয়েছেন সৌরীন্দ্র মিত্র তাঁর 'খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে' গ্রন্থে। এজরা পাউণ্ড কালীমোহন ঘোষের সাহায্যে কবিরের দশটি দোঁহার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন 'মডার্ন রিভিউ'তে ১৯১৩ জুনে। সৌরীন্দ্র মিত্রের মতে রবীন্দ্রনাথ এই অনুবাদ দেখে উদ্বিগ্ন এবং সন্ত্রস্ত হয়ে নিজেই অনুবাদের ভার নেন। সৌরীন্দ্র মিত্র অবশ্য রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগ এবং সন্ত্রাসের কোনো তথ্য আমাদের জানান নি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু জুন মাসেই ইণ্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে কথা বলে নিয়েছেন, অজিতকুমারের তর্জমা প্রকাশের ব্যাপারে এবং অনুবাদের শোধনেও অনেকটা এগিয়ে গেছেন। এর ব্যাখ্যাও সৌরীন্দ্র মিত্রের আছে, 'কিন্তু তার পূর্বেই (জুন) আমেরিকায় থাকতেই কালীমোহন ঘোষের নিকট বোধ করি

রবীন্দ্রনাথ উক্ত (এজরা পাউণ্ডের) অনুবাদ পরিকল্পনার খবর পান এবং হয়তো অনুবাদের কিছু নমুনাও চাক্ষুষ দেখে থাকবেন।' সৌরীন্দ্র মিত্রের আরো বিশ্বাস, এজরা পাউণ্ডকে না ডেকে আণ্ডারহিলকে ডেকে কবিরের তর্জমার জন্য পাউণ্ড ক্ষেপে যান, তাঁর রবীন্দ্রনিন্দার অন্যতম কারণ এই কবির তর্জমা। সৌরীন্দ্র মিত্র অবশ্যই তথ্য দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে মনে করেন নি।

অন্য তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের ধরে নিতে হবে, প্রাচ্যের বাণী প্রচারের যে দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন, কবিরের দোঁহার অনুবাদ সেই দায়িত্বেরই এক দিক। প্রসঙ্গত মনে করা যেতে পারে, ক্ষিতিমোহন সেনকে তিনি ইয়োরোপে পাঠাবার পরিকল্পনা করছেন এই উদ্দেশ্যেই। অজিতকুমারকে লেখা তাঁর চিঠি ১৯১৩ সালে ইংল্যাণ্ড থেকে, এর প্রমাণ দেবে। ক্ষিতিমোহন সেন ইংল্যাণ্ডে এসে হিন্দুস্থানের সাধককের সাধনসামগ্রী, যেমন তুকারামের দোঁহা, রামপ্রসাদের পদাবলী, চৈতন্যচরিত, দক্ষিণের দ্রাবিড় ভক্তদের কবিতা ইত্যাদি প্রচার করবেন, এই রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা। 'আমরা যে জানিইনে আমাদের কি আছে এবং তার মূল্য কত? সেইজন্যে আমাদের পথেঘাটে যা ছড়াছড়ি যাচ্ছে তাই আমি এদের কাছে ধরতে চাই।'

ব্যক্তিগত রচনা

কবি নন, তিনি কবিতার জন্য

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মণীন্দ্র মিত্র ছবি আঁকেন, কিন্তু কবিতার প্রতিও তাঁর অসীম অনুরাগ। শিল্পীর ঘরে যত ছবি, তার চেয়ে অনেক বেশি কবিতার বই। কবে অরুণকুমার সরকার, নরেশ গুহদের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ হয়েছিল, তারপর সখ্যতা— সেসব এখন ইতিহাস। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তর বিয়ে হয়েছিল রেজিষ্ট্রি করে— সাক্ষী ছিলেন শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মণীন্দ্র মিত্র। বিয়ের পর সস্ত্রীক কিরণশঙ্কর অবশ্যই ঢাকায় ফিরবেন, কিন্তু তার আগে কিছুদিন কলকাতায় থেকে যেতে হবে। আশ্রয় কোথায়? সেটাও বন্ধুদের দায়িত্ব, বিশেষ করে মণির।

মণির সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ শারদীয় গণবার্তার মলাটকে সামনে রেখে। যার সঙ্গে আলাপ তার সঙ্গেই মণির বন্ধুত্ব, এটাই ছিল তখনকার নিয়ম। কিছুকাল পরেই টের পেলাম, শুধু কবিতার প্রতি নয়, কবিদের প্রতিও তাঁর অনেক শুভেচ্ছা। কবির কাব্যগ্রন্থে শিল্পীর যতটুকু কাজ থাকে মণি তা বিনা পারিশ্রমিকে করে দেন। কবির বাদবিচার তাঁর কাছে নেই, বন্ধু এবং আগন্তুক-এর কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই।

শুধু ছবি, কবিতা এবং প্রচ্ছদ নিয়েই যদি মণীন্দ্র মিত্র-র সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তার শেষ হ'তো? মণির মনের ভিতর একটি গোপন ইচ্ছে কিন্তু অনেকদিন থেকেই উঁকি মারছিল— কবিতার জন্য তাঁর আরও কিছু করার আছে। তিনি সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

বোধহয় উনিশশো একষট্টি সন, চারদিকে রবীন্দ্রশতবর্ষের ধুমধাম। অরুণ ভট্টাচার্য, অরুণকুমার সরকার আর আমি— তিনজনে মিলেমিশে 'উচ্চারণ' পত্রিকা বের করেছি। শুধু কবিতার কাগজ। মণীন্দ্র মিত্রর মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও প্রকাশক বলে তাঁর নাম ও ঠিকানা ছাপা হ'য়ে গেছে। মণির বক্তব্য খুব

সহজ— এভাবে চলবে না। পত্রিকা প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব তাঁকে দিতে হবে। টাকার কথা তিনি ভাববেন, বইয়ের ছাপা ও বাঁধাই তিনিই দেখবেন। আমরা শুধু সম্পাদনার কাজ করবো।

তথাস্তু। এর আগে 'কবিতা মেলায়' দেখেছি মণি সব সময় আমাদের সঙ্গে নীরবে কাজ ক'রে যাচ্ছেন। এবার তাঁকে আরও কাছে পেলাম এবং কিছুটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। কোথা থেকে টাকা আসবে, এটা ছিল একটা মস্ত সমস্যা। তাছাড়া মণীন্দ্র মিত্রর মতো একজন শিল্পী কাগজটির অঙ্গসজ্জার সমস্ত দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিচ্ছেন; এতটা আমরা আগে ভেবে দেখি নি।

দ্বিতীয় সংখ্যায় পত্রিকাটির চেহারা পাল্টে গেল। কার্ট্রিজ কাগজে ছাপা, আর্ট-পেপারের মলাট, সিঙ্ক-প্রিন্টিং। আকারেও পত্রিকার প্রথম সংখ্যার দ্বিগুণ—নাকি তিনগুণ! ঠিক মনে নেই। ইতিমধ্যে অরুণকুমার সরকার দুই বন্ধুর কাছ থেকে ছুটি চেয়ে নিয়েছেন। কিন্তু সম্পাদনার কাজে তিনজন কেন, একজন হলেই তো চ'লে যায়। 'লিটল ম্যাগাজিন'-এর আরও অনেক কাজ। ছাপা, বাঁধাই, বিজ্ঞাপন— মলাটের প্রশ্নটাও এখানে উঁকি মারে। সব দায়িত্বই মণীন্দ্র মিত্রর, কাজেই ধুমধামের মধ্যেই পত্রিকা বেরুতে লাগলো।

আমার মনে কিন্তু প্রশ্ন ছিল, এভাবে বেশিদিন চলবে তো? খরচ ক্রমেই বাড়ছে, তুলনায় বিজ্ঞাপন অথবা বিক্রি ছিল খুবই সামান্য। মাইকেল মধুসূদনকে নিবেদিত কবিতা নিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা বের করা হলো, মণি তাতে এক পৃষ্ঠাও বিজ্ঞাপন নিলেন না। তাঁর খুশি। টাকার কথা আমাদের ভাবতে নেই, তবু বিষণ্ণতা র'য়ে গেল। যদিও মণি কথা দিলেন পরের সংখ্যায় বেশি ক'রে বিজ্ঞাপন নেবেন।

মণিকে নিয়ে ঐ সময় আমি একটি চার লাইনের কবিতা লিখেছিলাম:

'মণি মিত্র
আঁকেন চিত্র
উচ্চারণের মলাটে।

কীই যে আছে ললাটে?'

আমার মনে ভয় ছিল, উচ্চারণ-এর আয়ু খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে আসবে না তো? ভেতরের কার্ট্রিজ কাগজের কথা বাদ দিলাম, পত্রিকার মলাটের জন্য তিনি যেভাবে দু'হাতে খরচ করছেন (প্রতি সংখ্যায় নতুন সিঙ্ক-প্রিন্ট,

তার ওপর নিজের হাতে প্রতিটি বইয়ে নানা বিচিত্র রং-এর খেলা, অলংকরণ!)

একদিন আমাদের আশংকাই সত্যি হ'লো, কিন্তু আঘাতটা এলো অন্যদিক থেকে। মণীন্দ্র মিত্র কঠিন অসুখে পড়লেন। বেশ কিছুদিনের জন্য তাঁকে কারশিয়াং হাসপাতালে চলে যেতে হ'লো। আমি আর অরুণ ভট্টাচার্য তাঁর অনুপস্থিতিতেই একটি সংখ্যা বের করলাম— তবে কার্ট্রিজ কাগজে নয়; বইয়ের মলাটেও তাঁর সাধের সিল্ক-প্রিন্ট হৈ হৈ ক'রে উঠলো না। তারপর আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম, কবে মণি সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে ঘরে ফিরবেন?

ঘরে তিনি ফিরলেন, কিন্তু তখন আমাদের তিনমূর্তির পকেটেই একটা ক'রে বিরাট 'হাঁ'। উচ্চারণ আর বেরুলো না।

মণি কিন্তু এখনও হাল ছাড়েন নি। এখনও তিনি স্বপ্ন দেখেন, আবার পত্রিকা বের করবেন। মাঝেমধ্যেই আমাদের বৈঠক হয়, মণির স্বপ্ন তখন আমাদেরও স্পর্শ করে।

না থাক্ আমাদের কবিতা-পত্রিকা, মণীন্দ্র মিত্র আছেন। কবিতার জন্য কবিদের জন্য তাঁর আগ্রহ ও ভালোবাসার কোনো তুলনা নেই। যদিও আর একটি কাজী সব্যসাচীর কথা একই প্রসঙ্গে বারবার মনে আসে। তিনিও ছিলেন কবিতার জন্য পাগল।

কবিতার জন্য পাগলামি এক ধরনের সংক্রামক ব্যাধি। অনেককেই স্পর্শ করে, তবে বেশিদিন থাকে না। আমাদের বন্ধু, এবং মণির বিশেষ অন্তরঙ্গ অশোক মিত্র একদিন অরুণকুমার সরকারের চিঠি পেলে আর-সব ভুলে যেতেন। সেইসব চিঠির সঙ্গে কবিতা থাকতো। তাঁর কাছে আজ আর অরুণকুমারের চিঠি আসে না, তিনিও অন্য নানা কাজে ব্যস্ত। যদিও তাঁর ঘরভর্তি কবিতার বই।

কাজী সব্যসাচী এখন অনেক দূরে, অশোক মিত্র কাছে থেকেও দূরে। আর মণীন্দ্র মিত্র? তিনি আছেন।

মণি, আপনি ভালো থাকুন। আবার 'উচ্চারণ' বের করুন। মানস কথা দিয়েছেন, তিনি সম্পাদনার দায়িত্ব নেবেন। অরুণ আর আমি দূরে থেকেও আপনাদের সঙ্গে থাকব।

কবিতার জয় হোক, নতুন কবিরা আসুক। যেভাবে মণি মিত্র চিরদিন তাঁদের বুকে টেনে নিয়েছেন, আজও তাঁদের জন্য সেই অভ্যর্থনা থাকুক। এর বেশি কোনো প্রার্থনা একজন মানুষকে জানাতে নেই। নইলে, মণির কাছে আমাদের দাবিরও কোনো সীমা থাকত না।

অনুবাদ

অকটাভিয়ো পাৎস

কমলেশ চক্রবর্তী

লাতিন আমেরিকান লেখকদের মধ্যে যাঁদের সুনাম গত তিনচার দশকে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাভাষী অঞ্চলে ছড়িয়ে গেছে তাঁদের মধ্যে জন্মগতভাবে— মেক্সিকান কবি অক্টাভিয়ো পাৎস এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন।

লাতিন আমেরিকান দেশগুলিতে সাধারণত যা হ'য়ে থাকে পাৎস-এর কবিখ্যাতির ফলে তিনিও কূটনৈতিক ভবিষ্যৎ বেছে নিয়েছিলেন। যে পরিবারের গণ্ডীতে তাঁর কাব্যজীবন বিকশিত হয়েছিলো তা বৈপ্লবিক আবহাওয়ার ধ্যানধারণায় অভিষিক্ত। কর্মজীবনের প্রথম দিকে নানা কাজে যুক্তরাষ্ট্রে ফ্রান্সে ও জাপানে কাটিয়ে ১৯৬২-তে ভারতে স্বদেশের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছিলেন। এবং ১৯৬৮তে মেক্সিকোয় অলিম্পিকের সময়ে স্বদেশীয় সরকারের ছাত্রদের উপর গুলিচালানোর প্রতিবাদে যখন পাৎস তাঁর কূটনৈতিক কর্ম স্বেচ্ছায় ত্যাগ করলেন তখন তাঁর সুনাম এক নবতম রূপ নিল।

সাম্প্রতিক য়ুরোপীয় বিচ্ছিন্নতার সাংস্কৃতিক প্রবহণে অক্টাভিয়ো পাৎস নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রম এবং তদুপরি ভিন্নতর স্বাদের কবিপ্রতিভা। মূলত শব্দের প্রতি তাঁর আবাল্য মমতা সত্ত্বেও শব্দার্থে তাঁর মনযোগ কিছুমাত্র কম নয়। তাঁর সচেতন মানসে যা কিছু বিচ্ছিন্ন ও প্রতীকীত সত্য এবং জ্ঞানের যে সব এলাকা অকর্ষিত—সব কিছু সমভাবে প্রতিবিম্বিত হয়। যা সকলের অধীত ও বোধগম্য হয় নূতন কোনো গ্রাহ্য সত্যে তাই অভিজ্ঞতা হিসেবে রূপান্তরিত হয় তাঁর কবিতায়।

কবিতায় পাৎস যে কাব্যপ্রতিমা প্রকাশ করতে চেয়েছেন তাকে বলা যায়—"বস্তুবাদী জগতের যাদু থেকে বিমূর্ত 'জগতের অদৃশ্য স্পন্দন"-এ

উত্তরণ। অথবা ব্যারোক-প্রাচুর্যের ছায়া থেকে তিনি বর্তমানে দার্শনিক পুনর্ভাবনার প্রয়োজনের জিজ্ঞাসায় উপনীত হয়েছেন।

এই মহৎ কবির রচনার মান নির্ধারণ কোনো একজন অন্য ভাষার পাঠকের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কারণ তিনি যেমন মেক্সিকোর সহজাত আশ্চর্যময়তার মধ্যে নিবিষ্ট থাকেন, তেমনি আপ্লুত হন পরাবাস্তবতার ভাবনায় প্যারীর সাঁলোতে; ভারতের নিঃসঙ্গতায় তাঁর আত্মীক সত্যের অনুসন্ধানে, অথবা নব্য বামপন্থী রাজনীতিক পরিবেশে নিজের মাটিতে।

তাঁর এই প্রবাদতুল্য সচেতনতা লক্ষণীয় হয় যখন—অক্টাভিয়ো পাৎস আউখভিৎস অথবা হিরোসিমার মানুষের অবস্থা বর্ণনা করতে ব্যবহার করেন পালকসজ্জিত সর্পের ভয়াবহ প্রত্যাবর্তনের চিত্রকল্প। হয়ত বা মেক্সিকোর আদিম কালের উপকথার নারকীয় ঐশ্বর্য তাঁর মতো একজন নিবিষ্ট দার্শনিকের কাছে পারমানবিক যুগের প্রত্যক্ষ নিয়মের তুলনায় অধিক কাম্য ব'লে মনে হয়। মিগুয়েল আনজেল আসতুরিয়স ও অন্যান্য অনেক লাতিন আমেরিকান কবি জাঁকাল স্বদেশীয় অতীতচর্চায় নিয়ত নিয়োজিত। আর পাৎস প্রাচীনতার সঙ্গে একটা বিশুদ্ধ ভাবজাগতিক সম্পর্ক রেখে চলেন মাত্র। প্রাকৃতিক অবদান হিসেবে যা কিছু লভ্য—ইতিহাস, পুরাণ, উপকথা—সব কিছু ব্যবহার করেন চৈতন্যের ছাকনিতে ছেঁকে নিয়ে। তিনি কিন্তু নব্যধর্মান্তরিতের রীতিতে অনায়াসে প্রাচীনতম আকরগুলো বিন্যাস করতে পারতেন অথবা মেক্সিকো অধিকারের আগে পর্যন্ত যে সব এজটেক মনবৃত্তি প্রচলিত ছিলো তার চিরকালীন রহস্যময়তার সঙ্গে নিজের আত্মীক সমীকরণের প্রকাশ ঘটাতে পারতেন। অথচ পক্ষান্তরে, নিয়মনিষ্ঠভাবে ও বিচক্ষণতার সঙ্গে বহুবর্ণখচিত বস্তুর নাটকীয়তা আর প্রতিমার বিশৃঙ্খলতাই তাঁর কাছে গ্রহণীয় ব'লে মনে হয়েছে। নিজের কবিতা সম্পর্কে নিজেই লিখেছেন :

"হেমন্তে বিশাল নদীগুলো পথ আঁচড়িয়ে চলে, পর্বতের শিখরে জমা করে ঐশ্বর্য, বিস্ময়ের বিশুদ্ধ প্রস্তরে প্রতিফলিত আলোকে যে অমর বাণী প্রস্ফুটিত তাই মেক্সিকোর উপত্যকায় স্থাপত্য হ'য়ে ওঠে। এখন আমি একা এক একটি শব্দের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। শব্দটি কি আমার, নাকি আমিই শব্দটির। শিল্প না লাঙ্গুল, ঈগল অথবা সূর্য?"

"জেড পাথরের গায়ে আগুনের লিপি
প্রস্তর বিধ্বস্ত, সর্পদের রাণী,

বাষ্পের স্তম্ভের সারি, পাথুরে ফোয়ারা,
চন্দ্রের এ-সভা, ঈগল পাখির চূড়ো,
মৌরী গাছ, ক্ষুদে কাঁটা ঝোপ
বিষমুখী কন্টকী, চিরজীবী ব্যথা,
জলে ঢাকা উপত্যকা যাতে আছে রাখালবালিকা
আর মৃতদের উপত্যকা যিনি করেছেন রক্ষা,
ঘুমন্ত পাহাড় চূড়ো থেকে ঝুলে আছে লতা,
হামাগুড়ি দেয়া গুল্ম, বিষাক্ত উদ্ভিদ
পুনরুত্থানের পুষ্প, জীবনের আঙুর..."

,ভারসান্ত এস্ট'-এর অধিকাংশ কবিতাই রচিত হয়েছে ১৯৬২ থেকে ১৯৬৮-র মধ্যে। আর তখন পাৎস নতুন দিল্লীতে বসবাসকারী মেক্সিকান রাষ্ট্রদূত। এই গ্রন্থের প্রথম 'সূর্যের পিয়েদ্রা' নামক দীর্ঘতম কবিতাটি ১৯৫-তে মেক্সিকোতে প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটি পাঠে বোঝা যায় পাৎস অন্তত এখানে পরাবাস্তবতার কত কাছাকাছি। ভয়াবহ ও সুন্দর বস্তুর বোঝাপড়া, পবিত্র উৎসবের মতো বস্তুজগৎ ও জীবজগতের অঙ্গাঙ্গীকতা, আধিদৈবিক ভাবনা ভরা ব্যারোক-প্রকৃতিবাদ, স্বপ্নের বিন্যাস, নেশাগ্রস্ততা ও বিকার— এই সব-কিছু স্মরণ করিয়ে দেয় যা, তা নেতা হিসেবে আন্দ্রে ব্রেতোঁ নির্দেশ দিয়েছিলেন। পাওয়া যায় নির্দেশের চেয়ে বেশি কিছু, যেমন করেছিলেন— দ্বিতীয় পরাবাস্তবতাবাদের পথিকৃৎগণ অর্থাৎ এ্যাসে সেজেয়ার, উলফ্রেড লাম ও মাত্তা।

নব্য এই কবিতার অধ্যায়ে এক প্রগাঢ় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়—একে বলা যায় পাৎস-এর ভাবনাময়তার অধ্যায়। ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগ নিশ্চয় তাঁকে মোহাবিষ্ট করেছিল। কিন্তু মুগ্ধতা শুধু নয়, এই সব কবিতায় আমরা যা পাই তা হচ্ছে—বস্তুজগৎ ও অনুভূতির জগতের মর্মমূলে প্রবেশের এক অদমনীয় আকাঙ্ক্ষা। শব্দের ঋজুতা কবিতাগুলিকে কেবল সারাৎসারে রূপান্তরিত করেছে— প্রদান করেছে সংক্ষিপ্ততা যার ফলে শব্দের এক সম্পূর্ণ নূতন আভিজাত্য প্রকাশ পেয়েছে। পরাবাস্তববাদী উচ্ছ্বাস, ব্যারোক-আনন্দ যা কথিত গীতময়তার প্রাধান্য দিয়েছিল তাই নিয়োজিত হ'ল শব্দের গভীরতর দার্শনিকতার অন্বেষণে। শব্দ ব্যবহৃত হ'ল খাঁটি সত্যকে প্রকাশ করার জন্য।

অথবা কোনো বৈপরীত্য, কিম্বা কোনো বাস্তব দীর্ঘশ্বাস লিপিবদ্ধ করার জন্য। এ প্রসঙ্গে কবির 'ঐকতান' কবিতাটি অনুভব করা যাক :

"উপরে জলের ছায়া
ভূমিতে বনের রেখা
বাতাস বহতা পথে
নিশ্চুপে থাকে কুয়ো
কালো বালতিতে জল কাটে
জল ছুঁয়ে যায় গাছদের
আকাশ পৌছায় অধরোষ্ঠে।"

পাৎস-এর কাব্যপ্রতিমার নানা অধ্যায়, অবশ্য তা সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, অনুপ্রেরণা-নির্ভর নয়। এমন কী ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের রচনাতেও লক্ষণীয় যে তিনি বাহ্যঘটনাসমূহের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানে ব্যস্ত এবং তার প্রকাশের জন্য অত্যন্ত সোজাসুজি, কাটছাট, বাক্‌প্রতিমা ব্যবহারে উদ্‌গ্রীব। ব্যারোক বিস্ফোরণ, উদ্বেগময় আবেগ, স্যুররিয়ালিষ্ট অচেতনতা এবং ভারতীয় ভাবনা থেকে গৃহীত মানসিকচৈতন্য এমন এক সংশ্লেষণ ঘটায় যা কখনো মনে হয় না মেকি। পাৎস-এর সংবেদনশীলতা এর সব-কিছুই অত্যন্ত সহজে আত্মসাৎ করে এবং তৎসত্ত্বেও প্রজননে সক্ষম থাকে।

॥ দুই ॥

অক্‌টাভিয়ো পাৎস মেক্সিকোতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে যোগ দেন স্পেনের গৃহযুদ্ধে এবং ১৯৩৮-এ গৃহযুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দুটো সাহিত্য পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। "তাল্লের" এবং "এল হিজো প্রোদিগো" —পত্রিকা দুটোতে তৎকালীন স্পেনের ও লাতিন আমেরিকার প্রায় সব মূল্যবান লেখকই প্রকাশিত হতেন। ১৯৪৪-এ এলেন মার্কিন দেশে, ১৯৪৫-এ গেলেন পারীতে। এরপর বেশ কয়েক বছর পাৎস পারীতেই কাটিয়েছেন স্যুররিয়ালিস্ট গ্রুপের সঙ্গে মেশামেশি করে। এই সাময়িক কাব্য-আন্দোলনের গুরু আন্দ্রে ব্রেতোঁ লাতিন আমেরিকার কবি সম্পর্কে তৎকালে লিখেছিলেন, 'স্প্যানিস ভাষার কবি যিনি আমাকে সবচেয়ে অধিক মোহিত করেন— তিনি হচ্ছেন মেক্সিকান কবি অক্‌টাভিয়ো পাৎস। স্যুররিয়ালিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে পাৎস-এর কবিতা এক বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে।'

এই অভিজ্ঞান অবশ্যই পাৎসকে আধুনিক কাব্যইতিহাসের প্রবহনে এক বিশিষ্ট স্থান দিয়েছিল।

মেক্সিকোর বিদেশ মন্ত্রণালয়ে যোগ দিলেন পাৎস এই সময়েই। নানা কাব্যব্যপদেশে বসবাস করলেন সানফ্রান্‌সিস্‌কো, নুইয়র্ক, পারী, টোকিও, জেনিভা ও অবশেষে নতুন দিল্লী। দিল্লীতে পাৎস ছিলেন ১৯৬২ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত— কূটনৈতিক কার্যে তাঁর জীবনের দীর্ঘতম সময়। আর এই সময়ই তাঁর জীবনের, তাঁর কাব্যের সবচেয়ে মূল্যবান, সবচেয়ে গর্বের পরিবর্তনগুলো সংঘটিত হল। দিল্লীই তাঁর জীবনের শেষ রাজধানী যেখানে তিনি কূটনীতিক হিসেবে বাস করেছেন। এখান থেকেই তাঁর এই সরকারি কাজের সমাপ্তি। পরবর্তী বছরগুলোয় তিনি কেম্‌ব্রিজ, হার্ভার্ড প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থেকেছেন।

॥ তিন ॥

অক্‌টাভিয়ো পাৎস এক ধ্যানী কবি। যাঁর ধ্যানের অন্যতম বিষয় মেক্সিকো। আর সেই ভাবনার কণিকা তাঁর রচনায় ছড়িয়ে আছে হীরকখণ্ডের দ্যুতি নিয়ে। তাঁর একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধের অংশ এখানে প্রাসঙ্গিক :

'আমরা, লাতিন আমেরিকানরা, বস্তুত ইতিহাসের শহরতলীর, মফস্বলের বাসিন্দে। অনিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আমরা পশ্চিম দেশের পেছনের দরজা দিয়ে পশ্চিমের আঙিনায় প্রবেশ করেছি। আমরা যখন অনধিকারে প্রবেশ করেছি তখন কিন্তু আধুনিকতার চমকপ্রদ কাণ্ডকারখানা পরিদর্শনের জন্য প্রজ্বলিত সবগুলো বাতিই নিবু নিবু। অর্থাৎ আমরা যেখানেই গিয়েছি— গিয়েছি অত্যন্ত দেরি করে। আসলে আমরা যখন জন্মালাম তখনই ইতিহাসের অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল। আমাদের কোনো অতীত নেই অথবা যদি বা কিছু থেকে থাকে আমরা তার ভগ্নদশার মুখে অনেকদিন আগেই থুতু ছিটিয়ে দিয়েছি। আমাদের সমস্ত জাতটা এক শতকের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর যখন তারা নিদ্রাভিভূত ছিল তখন তারা লুণ্ঠিত ও রিক্ত হয়েছিল। ফলে এখন তাদের ছিন্ন কন্থাই সম্বল। স্পেনীয়রা যা রেখে গিয়েছিল আমরা সে সবও যত্নে রাখি নি। এ ওর পেটে পিঠে ছুরি চালিয়ে আমাদের দিন কেটেছে। তথাপি যাকে আধুনিক যুগ বলে অর্থাৎ গত শতকের শেষ থেকে

শুরু করে নিয়মিত ভাবনার বিরোধী এই ভূমিতেই জন্মেছেন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনীয় কবি, গল্পরচয়িতা এবং চিত্রশিল্পীরা।'

এই মায়াময় দেশপ্রেম দুর্লভ বলেই মনে হয়। মেক্সিকো নিয়ে কবির প্রখ্যাত ধ্যান শুরু হয়েছে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অর্থাৎ তাঁর 'নিঃসঙ্গতার গোলোকধাঁধা : মেক্সিকোর জীবন ও ভাবনা' গ্রন্থ থেকে। বক্তব্যের গভীরতা ও রচনাশৈলীর নৈপুণ্য বিস্ময়কর। পোরফিরিয়ো রাজত্বের শেষ বছরগুলোয় মেক্সিকোর অস্তি ও নাস্তির দ্বান্দ্বিক ভাবনার পরিণতি এই গ্রন্থ। উদার মানবিকতাবাদের নামে এবং দৃষ্টবাদের পরিবর্তে যা রাজনৈতিক ও সামাজিক অত্যাচারের স্বপক্ষে ব্যবহৃত; বুদ্ধিবাদী ঐতিহ্যের নামে যার শেকড় পৃথিবীর সবচেয়ে নরম মাটি অর্থাৎ স্পেইনের বুকে নিহিত— যা দেশের ধারকরা অর্থ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভাবনার পরিপন্থী; আলফোন্সো রেইয়েস, আন্তোনিও কাসো, সামুয়েল রামোস-এর মতো পূর্বসূরী এবং অক্টাভিয়ো পাৎস, লিওপোল্ডো জিয়া, লুই ভীলোরো ও আবালার্ডো ভিলাজাস-এর মতো উত্তর-সূরীগণ পেদ্রো হেনরিকুয়েজ উরেনার সক্ষম নেতৃত্বে মেক্সিকো তথা লা[illegible] আমেরিকার যথার্থ চারিত্র নির্মাণের [illegible]

যা ১৯৬৭তে অর্থা[illegible] —

তত্ত্ব ও নৈতিকতাবোধে[illegible]

“জাতীয় কাব[illegible]

ধারণায় [illegible]

পরিত্যক্ত, ভুলে যাওয়া ঐশীশক্তির সঙ্গে পুনরায় ভাব বিনিময় হয়। ঐশী শক্তিসমূহের সৃষ্টি দেহ থেকে, সংগীত থেকে, ভিয়েতনামের শিশুদের ক্রন্দনমুখর মুখমণ্ডল চুম্বনের আনন্দ থেকে। দেহ, দেহের চিরকালীন রহস্য, আবিষ্কৃত অনাবিষ্কৃত আমাদের রমণীদের দেহ পাৎস-এর কাছে একাকার হয়ে যায় স্বদেশ, নগরী, অরণ্য, সমুদ্র ইত্যাদি পৃথিবীর মূল উপকরণগুলোর সঙ্গে। বস্তুতপক্ষে "সানস্টোন" নামক দীর্ঘ কবিতাটি পাঠ একজন সচেতন কাব্য-পাঠকের নিকট এমন এক অভিজ্ঞতা যা বোধ করি খুব কম কবিতা পাঠেই অর্জন করা যায়। অর্থাৎ যে অভিজ্ঞতা পোল ভালেরির সমুদ্রতীরের কবর খানা, র‍্যাঁবোর মাতাল তরণী, মালার্মের ফনের দিবাস্বপ্ন, অথবা য়েট্স-এর বাইজানটিয়ামে নৌকোযাত্রা-র ন্যায় কতিপয় কবিতা পাঠে ঘটে।

"আমি তোমার শরীরে অন্তর্লীন যেন পৃথিবীতে,
তোর নাভিদেশ যেন সূর্যের আলোকে ধোয়ানো শহর,
দুই স্তন যেন তোর দুই গীর্জে, অনুষ্ঠিত হয়
রক্তের তুলনীয় গভীর মহান রহস্য পুজার্চনা,
আমার চোখের দৃষ্টি ঢাকে তোরে খুব শ্যামল লতায়,
মহড়ায় ক্লান্ত সেই সাগরের পাড়ে নগরীর মতো
তুমি দুর্গ রমণীয় তীর্যক আলোকে রয়েছ বিভক্ত
দুই ভাগে, খুব স্পষ্ট, পীচ ফল সুলভ গোলাপী,
পুনরায় লবণাক্ত, পাথরের স্তূপ এবং পাখি
কেন্দ্রীভূত দুপুরের অনুশাসনের তলে আচ্ছাদিত,
আমার কামনার রঙে সজ্জিত উজ্জ্বল সাজে তুমি
যেমন নিরাভরন ভাবনা আমার এসেছ তেমনি,……"

এমনি প্রতিচ্ছত্রে নারীর দেহ ও মাতৃভূমি, কাম ও দেবতার জন্ম, গৌরব-অগৌরবের অতীত ও বর্তমানের গভীর রহস্যময় নিরাসক্তি কবিতাটিতে পর্যায়ে পর্যায়ে উন্মোচিত হয়েছে। "মেক্সিকান কবিতার ইতিহাস" নামক তাঁর বহুপঠিত প্রবন্ধে লিখলেন :

"স্পেইন : শব্দটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে লাল ও সোনালি, কালো ও রক্তবেগনী, একটি রোম্যান্টিক শব্দ। দুই বিপরীতের টানাপোড়েনে বিদ্যমান, একাধারে কার্থেজিনিয়ান ও রোমান ক্যাথলিক ও মুসলমান, মিডিয়েভেল ও রেনেশাঁসীয়। য়ুরোপীয় ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়কে সূচীত করতে যে-

সমস্ত শব্দ সূত্র ব্যবহার করা হয় তার কোনো-একটিও সম্ভবত স্পেইনের ঘটনা-পরম্পরা বর্ণনার প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায় না। বস্তুত, "ঘটনা বিস্তার" বিষয়ে কিছুই বলা যায় না; কারণ এ দেশের ইতিহাস হচ্ছে ক্রমান্বয়ে হঠাৎ হঠাৎ উত্থান ও পতনের কাহিনী, কখনো নৃত্যপরা কখনো মুহ্যমান।"

এই প্রবন্ধের অন্যস্থানে রয়েছে :

"যখন ইতিহাস আমাদের সন্দেহ করতে শেখায় যে ইতিহাস আসলে আর ভৌতিক মিছিলের চেয়ে বেশি কিছু নয়, এর কোনো যথার্থতা অথবা পরিণতি নেই, তখন ভাষার রহস্যময়তা প্রবল হয়ে দেখা দেয় এবং কোনো যথার্থ ভাববিনিময়ের পরিপন্থী হয়ে ওঠে।"

আসলে এই সব মূল্যবান তথ্য যা পাৎস অনর্গল তাঁর কবিতায় ও প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন তার পুরো হদিস না পেলে, তার পুরো মর্মোদ্ধার করতে না পারলে আমরা লাটিন-আমেরিকা নামক গোটা দেশটা, তার অতীত-বর্তমান, বিপ্লব-পরাজয়, শ্যামলিমা-অগ্নিগর্ভতা, কোনো কিছুই তেমন অনুধাবন করতে পারবে না।

॥ চার ॥

১৯৬২ থেকে ছয় বৎসরের কবির দিল্লীর কর্মজীবনের সময় মনে হয় তাঁর কাব্য পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। সেই সময়ই রচনা করেছেন ভারতবর্ষের নানা বিষয়ের উপর বেশ-কয়েকটি কবিতা। আমার মনে হয় অন্য কোনো বিদেশী কবি, য়েটস ও পাৎস ভিন্ন, ভারতবর্ষের ভাবনায় নিজের কিছু রচনাকে অনুরঞ্জিত করতে অন্য কোনো বিদেশী কবি সক্ষম হয় নি। পাৎস-এর ভারতবর্ষ অনুষঙ্গের কবিতাবলীর অন্যতম "বৃন্দাবন"।

বৃন্দাবন

অক্টাভিয়ো পাৎস

নিশীথিনী পরিব্যাপ্ত
দীর্ঘশ্বাসের বিপুল বনরাজী
বৃহদায়তন অস্থির পর্দার
মর্মর

আমি লিখি
আমি থামি
আমি লিখি
(সব কিছু আর কিছু নয়
আর সবকিছু পাতার উপর ঝরে ঝরে পড়ে
শব্দহীন)
মুহূর্ত আগেই
সড়ক দিয়ে দ্রুত গেছে একটা মোটর
নির্বাপিত আলো গৃহসারি তার ধার দিয়ে
আমিও ধাবমান
প্রজ্বলন্ত আমার ভাবনামালায়
মাথার উপর নক্ষত্রমণ্ডল
এমনি নিঃশব্দ বাগান
হয়েছিলাম এক বৃক্ষ এবং বাষ্ময়
পত্রপল্লবে আর চোখে চোখে ছিলাম আবরিত
ক্রমশ এগিয়ে আসা কানাঘুষো
দলবদ্ধ প্রীতীকেরা
(এখন দিলাম কয়েকটি
ভাঙাচোরা আঁচর
শুভ্রতার উপর কালিমাময়
অক্ষরের ক্ষুদ্রায়তন উদ্যান
বাতিদানের আলোয় হয়েছে প্রোথিত)
মোটর চলেছে দ্রুত
ঘুমন্ত প্রান্তিক শহর ছুঁয়ে ছুঁয়ে
আমি ধাবমান
ভাবনার অনুসরণ করি নিয়ত
আমার এবং অন্যদের
স্মৃতির অথবা কল্পনালতার
নামাবলী

স্ফুলিঙ্গের অবশেষ
মধ্যযামিনীর হাস্যরাশি
মুহূর্তের নৃত্য
নক্ষত্র কালপুরুষের পদযাত্রা
আর অন্যসব অখ্যাত স্থানের
আমিও কি তবে মানবিকতায় আস্থাবান
অথবা নক্ষত্রে ?
বিশ্বাস করেছি
(সারিবদ্ধ
বিন্দুমালা)
দেখি
কালের কবলে ক্ষীণপ্রাণ বারান্দার স্তম্ভরাজী
ক্ষয় হয়ে গ'ড়ে ওঠে নানান স্থাপত্য
যেন দুই সারি ভিখারি মিছিল
কটুগন্ধময়
সিংহাসনে নৃপতি ব'সে
পরিব্যাপ্ত
গন্ধের যাওয়া আসা
যেন তারা সব আদরিণী রক্ষিতারা
বিশুদ্ধ যেমন দেহের মতন প্রবাহিত
চন্দন থেকে যুঁই গাছে গাছে
এবং এদের ভূত
আকৃতির উত্তাপ সময়ের উত্তাপ
মিলেমিশে আনন্দ স্ফুরিত
চরাচর স্তব্ধ, মনে হয় ময়ূরের নৃত্য— নিয়ত পেখম
অগণিত চক্ষু
অন্যসব চোখে প্রতিবিম্বিত
কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন
প্রতিধ্বনি ওঠে পড়ে একমাত্র চক্ষু থেকে

একক নিঃসঙ্গ সূর্য
আচ্ছাদিত
বসনের স্বচ্ছতার বাস্তব আড়ালে
চমৎকারিতার জোয়াড়ে
দৃশ্যমান সব হয় প্রজ্বলন্ত
প্রস্তর নারী বা জল
সব রূপান্তরিত স্থাপত্যে
বর্ণ থেকে অবয়বে
অবয়ব থেকে অগ্নিশিখা
যা-কিছু বিলীয়মান
কাঠ ও ধাতুর গান
ঈশ্বরের গোপন প্রকোষ্ঠে
মন্দিরের গোপন জঠরে
সংগীত যেন ঠাসবুননের সূর্য
সংগীত

যেন বাতাস-জলের কোলাকুলি
বস্তুপুঞ্জের
বিপর্যস্ত দীর্ঘশ্বাস ছাপিয়ে উঠেছে
মানুষের কণ্ঠস্বর
দুপুরের দারুণ গরমে যেন চন্দ্র এক
বায়ুভূত আত্মার অভিযোগ
(লিখি শুধু—
কতটুকু ছুঁয়েছে এ-লেখা আজো রয়েছে অজানা
রচিত ছত্রের প্রতি লক্ষ্যপাত হ'লে দেখি
এই আলো আমার প্রতীক
প্রজ্বলন্ত
রাত্রির মধ্যগগনে)
যাদুকর
সন্তস্ত লাঙ্গুলহীন

ঝুলন্ত বিড়ার 'পর
বর্ণহীণ ভস্ম আচ্ছাদিত
কোন্ সাধু দূর থেকে যেন অন্য কোনো তট থেকে
মৃদু হেসে তাকায় অপাঙ্গে
দেখে কৌতূহলে সন্তদের মতো জান্তব দৃষ্টিতে
উলঙ্গ ঝাঁকড়া চুলে তেলে জলে
স্থির জ্যোতি দুই চোখ ধাতব উজ্জ্বল
আমি চেয়েছিলাম বাক্য বিনিময়
উত্তর উঠল জঠরের গভীরের গম্ভীর
অন্য কোথা অন্য কোথা
কোন্ খানে ?
জীবনের কোন্ অংশে
কোন্ অস্তিত্বে
কোন্ পৃথিবীর মুক্তাঙ্গনে
কোন্ সে সময় ?
(করি যা রচনা
প্রত্যেক অক্ষর কীটসম
স্মৃতি
ভেসেছে জোয়ারে
আবার পুনরাবৃত্তি আপন মধ্যাহ্ন)
অন্য কোথা অন্য কোথা
সন্ত তুমি যে নির্বোধ সন্ন্যাসী
ক্ষুধা কিংবা নেশা বশে
হয়তো বা দেখেছিলে কৃষ্ণ
উজ্জ্বল নীলাভ অটবী
প্রবল খরায় কালো জলের উৎসার
হয়তো বা খণ্ডিত প্রস্তরে
দেখেছে সে রমণীর অবয়ব

মুণ্ডিত মস্তকে
বিদেহী সে আচ্ছন্নতা'
এসব কারণে
নির্মান করেছে আবাসন সে এই শ্মশান ঘাটে

জনশূন্য পথরেখা
গৃহরাজি আর তার প্রলম্বিত ছায়া
সব কিছু মূলে এক অথচ প্রভেদ কতো
দ্রুত ধাবমান মোটর গাড়িটি
আমি তো নিশ্চুপ
ব'সে আছি স্তব্ধ হ'য়ে ভাবনার দ্রুত পলায়নে
(অন্য কোথা অন্য কোথা
ভাঁড় তুমি সাধু সন্ন্যাসী ভিখারী নৃপতি পাতক
একই নামের জন্য
সর্বদা সমান
একের ভেতর
থাকবে সর্বদা নিজের অন্তরে
বড়ো কাছাকাছি
নিজের নিজস্বতার কাছাকাছি
জীর্ণ সে প্রতিমা)
অন্য কোথা অন্য কোথা
ভিন্ন তীর থেকে লক্ষ্যভেদে দেখে সে আমায়
আমাকে দেখে সে
তার দীর্ঘ অতি দীর্ঘ দ্বিপ্রহর থেকে
তখন রয়েছি আমি ভ্রাম্যমাণ সময়ের কাছে
গৃহরাজি ছুঁয়ে ছুঁয়ে গাড়ি ছোটে ঊর্ধ্বশ্বাসে
প্রদীপ শিখার নিচে যখন মগ্ন রচনায়
যা কিছু পরম যা কিছু অমর
যা কিছু আবর্তিত সেই কেন্দ্রে
গ্রহণ করিনি কিছু বিষয় হিসে'ব
জীবনের জন্য আর মৃত্যুর প্রয়োজনে প্রতীক্ষিত

জানা আছে জ্ঞানের পরিধি—করি রচনা সেসব
কালের পুতুল
বিন্যস্ত ঘটনা
নিশ্চিন্ত প্রবেগে অখণ্ড অস্তিত্ব হয়ে
মূর্তিমান এবং বিনাশ
চৈতন্যের আর যে হাতে ধরেছে কালের পুতুল
একমাত্র ইতিহাস আমি
আপন স্মৃতির আবিষ্কারে নিয়োজিত—
নিঃসঙ্গ থাকিনি কোনোদিন
অফুরন্ত চলে আলাপন
তুমি আমি পরস্পর
অন্ধকারে সঞ্চারিত
বপন করেছি প্রতীক প্রতিমা

মিরোস্লাভ হোলুবের কবিতা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(গত সংখ্যায় প্রকাশিত অনুবাদ কবিতাগুচ্ছের শেষ অংশ)

১৩ বড়দিনের রোহিতনিধন বিষয়ে

হাতে নেয় দারুনির্মিত হাতুড়ি
আর ছুরি
এবং ঠিক জায়গাটিতেই কোপ বসায়
যাহাতে সে আর বেশি ঝাপট মারে না, কেননা
ঝাপটগুলি বড্ড বেশি জটিলতা সৃষ্টি করে আর মুনাফাও হ্রাস পায়।
আর নিছক দর্শকেরা তির্যকভাবে তাকায়, দক্ষতার প্রশংসা করে
আর তাহাদের টাকার থলির উদ্দেশে হাত বাড়ায়। আর মোড়ক বাঁধিবার
কাগজ তো প্রস্তুত। আর চিমনিগুলা তো ধোঁয়া উগরাইতেছে।
আর জানালা দিয়ে উঁকি মারে বড়োদিন, জমিকে আলিঙ্গন করে
আর পিপাসাগুলির মধ্যে ফেনা ছিটায়।

ইহাই হর্ষ ও উল্লাসের বিধি।

শুধু আমার চমক লাগে রোহিত মৎস্য ইহার উপযুক্ত প্রাণী কি না
এই কথা ভাবিয়া।
অনেক ভালো হইত বরং, যদি এমন কিছু থাকিত
যে, যখন তাহাকে তোলা হইল, মাটিতে চিৎপাত রাখা হইল,
জোরে চাপিয়া ধরা হইল,
যে তাহার নীল চোখ বিন্যস্ত করিবে
দারু হাতুড়িতে, ছুরিকায়, টাকার থলিতে, মোড়ক বাঁধিবার কাগজে,
নিছক দর্শকদের উপর, ধূমায়িত চিমনিগুলায়
আর যিশুর জন্মোৎসবে।

এবং তাহার পরও কোনো মতে
কিছু বলিতে পারিবে। যেমন

আহা, ইহা আমার জীবনের সেরা মুহূর্ত ; আমার স্বর্ণ দিবস।
কিংবা
আমার উপরে তারকাখচিত আকাশ আর আমার মধ্যে নৈতিক সংহিতা।
কিংবা
আরে ইহা যে নড়িতেছে !

অথবা অন্তত
হাল্লেলুইয়া !

১৪ হাস্য বিষয়ক

যখন হাসিয়া উঠি আমরা এ-কান হইতে ও-কান পর্যন্ত মুখ ব্যাদান করি,
অথবা ঐরূপ কোনো চেষ্টা করি,
এবং দন্তবিকাশ করি, উহার দ্বারা বুঝাই
বিকাশের সেই বিগত স্তরগুলোকে
যখন হাস্য অভিব্যক্ত করিত
নিপাতিত যমজ ভ্রাতার উপর বিজয়বার্তা।
আমরা গভীরভাবে কণ্ঠনালী হইতে শ্বাসত্যাগ করি,
যখন যে মতো প্রয়োজন, কোমলভাবে স্পন্দিত করি
স্বরশিরাগুলি, কিংবা কপালে হাত দিই
অথবা ঘাড়ে, নয়তো হাত কচলাই আর
উরু চাপড়াই, ইহাই প্রকাশ করিত যে বিগত স্তরগুলার,
বিজয় আরো বুঝাইত

ক্ষিপ্রপদ।
সাধারণভাবে বলিতে গেলে আমরা তখনই হাসি যখন হাসিবার ইচ্ছা হয়।

তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা হাসিয়া উঠি
হাসিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও,

আমরা হাসি কেননা হাসিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, অথবা
আমরা হাসিয়া উঠি যখন তাহা পুরাপুরি নিষিদ্ধ।

আর সত্যি বলিতে, হাসিয়া পেটে খিল ধরাই আমরা
হাসিয়া মুণ্ডুটা উড়াইয়া দিই
যাতে আমাদের শুনিতে না হয় কোথায় কেমনভাবে
কে একজন সবসময় আমাদের দেখিয়া হাসিতেছে।

১৫ প্লাবন বিষয়ে

আমাদের এই কথা বিশ্বাস করাইয়াই বড়ো করা হইয়াছি
কোনো বন্যা শুধু তখনই —
যখন জল

সমীপবর্তী কোনো জলার মতো।
কোনো ভেজা চৌবাচ্চার মতো।
স্তব্ধতার মতো।
কিছুই না-এর মতো।

কোনো সত্যিকার বন্যা আসে তখন যখন বুড়বুড়ি তুলিয়া
ফেনা ছোটে আমাদের মুখ হইতে
আর আমরা তাহাদিগকে ভাবিয়া লই
কথার তোড়।

১৬ ফাটল বিষয়ে

প্রতি মুহূর্তেই কিছু না কিছু ফাটিতেছে কারণ
কোনো ডিম,

কিন্তু জোড়া লাগানো ডিম কি আর ডিম থাকে !
কোনো তাপ্পি লাগানো বর্ম তো আর বর্ম নহে,
যতই ডাক্তারি পট্টি বাঁধা হোক
পট্টিবাঁধা গোড়ালি হইল আকিলিস গোড়ালি, আর
কথায় যাহাকে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে সেই মানব তো
আর সে নাই একদিন যাহা সে ছিল,
বরং সে হইয়া ওঠে অন্যসকলেরই আকিলিস গোড়ালি।

সব-চাইতে বিশ্রী হয় যখন শত-শত জোড়ালাগানো ডিম
নিজেদের সেরা ডিম বলিয়া চালাইয়া দেয় আর শত-শত
ঝালাই-করা বর্ম বাজার মাৎ করে যথার্থ বর্ম হিশাবে,
আর শত-সহস্র ফাটা-চেরা লোক নিজেদের চালাইয়া দেয়
একশিলা বলিয়া।

তখনই দেখা দেয় একটি প্রকাণ্ড ফাটল।

এই ফাট-ধরা জগতে আমরা শুধু এইটুকুই করিতে পারি
যে মাঝে-মাঝে চ্যাঁচাইয়া উঠিতে পারি, শ্রীযুক্ত নির্দেশক,
সিঁড়ির উপর সাবধানে পা ফেলিবেন,
একটি ফাটল আছে আপনার,
যদি অনুমতি দেন তো বলি।

এই মাত্রই। তাহার পর তো শুধু আরো অনেক ফাট-ফাট-ফটাশ।

১৭ পরীক্ষানল বিষয়ে

নাও
একটুখানি আগুন, কিঞ্চিৎ জল,
খরগোশ বা গাছের সৎসামান্য,
কিংবা মানুষের যে-কোনো ক্ষুদে টুকরা,
তারপর ঘাঁটো সবকিছু, মেশাও, ভালো করিয়া ঝাঁকাও,
ছিপি ঠুশিয়া আটকাও,

রাখো তাহাকে কোনো উষ্ণ স্থানে, অন্ধকারে, আলোয়, তুহিনের মধ্যে,
কিছুক্ষণ ঐভাবেই থাকিতে দাও তাহাকে—যদিও তোমাকে কিন্তু
কেহই ছাড়িয়া দেয় না—
আর ইহাই হইল মূল কথা।

আর তারপর
তাকাইয়া ছাখো একবার—আর সে বাড়িতে থাকে,
কোনো ক্ষুদে সমুদ্র, কোনো একরত্তি অগ্নেয়গিরি,
কোনো ছোট্ট গাছ, ক্ষুদ্র এক হৃদয়, ক্ষুদ্র কোনো মগজ,
এতই ছোটো যে তুমি শুনিতেই পাও না
তাহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য তাহার সে কী ব্যাকুল অনুনয়,
আর ইহাই হইল মূল কথা, এই না-শোনা।

তাহার পর তুমি গিয়া
তাহা নথিবদ্ধ করো, সব দোষ বা
সব গুণ, কোনোটার পাশে বিস্ময়চিহ্ন,
নথিবদ্ধ করো সমস্ত শূন্য অথবা সমস্ত সংখ্যা, কারু পাশে-বা বিস্ময়চিহ্ন !
আর আসল কথা হইল যে কোনো পরীক্ষানল হইল
প্রশ্নকে বিস্ময়চিহ্নে রূপান্তরিত করিবার এক যন্ত্র।

আর মূল কথা হইল ইহাই
কিছুক্ষণের জন্য তুমি ভুলিয়া যাও যে
তুমি নিজেই আছো
পরীক্ষানলটির ভিতরে।

১৮ আলোর বিষয়ে

আমরা আলো বানাই দেখিব বলিয়া

সিলুরিয়ান যুগে তাহারা আলো বানাইয়াছিল যাহাতে তাহারা
সিলুরিয়ান শিলাগুলি দেখিতে পারে।

পাললিক যুগে তাহারা আলো বানাইয়াছিল যাহাতে তাহারা
প্লাবন দেখিতে পারে।
ট্রয় নগরীতে তাহারা আলো বানাইয়াছিল যাহাতে তাহারা
ট্রয়কে দেখিতে পায়।
সেই সময়ে তাহারা দেখিয়াছিল গ্রীকদের যাহারা আশেপাশেই ছিল।
আলোকপ্রাপ্তির যুগে তাহারা আলো বানাইয়াছিল যাহাতে তাহারা
আলোকপ্রাপ্তি দেখিতে পারে।
আর এইভাবেই আছে বিষয়টা আজও।
বস্তুত কতিপয় প্রজাতিই তো এই উদ্দেশ্যে গজাইয়াছে, যেমন জোনাকি,
আর কিছু-কিছু প্রত্যাদিষ্ট পেশাও, যেমন মশালধারী।
বহু ধরনের শক্তিই আলোকে রূপান্তরিত হয়,
বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক, বলবিদ্যক, জীববিদ্যক।
এমনকি মাঝে মাঝে ব্যাটারিও মেলে।
এতই আলো হইয়াছে যে আমরা মোড়ের মাথা অব্দি দেখিতে পারি,
জঠরের ভিতরটা দেখিতে পারি,
রাত্রির শিকড়গুলি সুদ্ধ দেখিতে পারি।

দেখাটা
হয়তো ততটা উপভোগ্য নাও হইতে পারে।
কিন্তু ইহাই দেখা জরুরি যে
আমরা আলো বানাইতে পারি,
আলো,
আলো,
আলো,
যতক্ষণ-না চোখ ধাঁধাইয়া আমরা অন্ধ হইয়া যাই।

১৯ অর্থ বিষয়ে

গোল ইহাই যে সবকিছুরই বাস্তবিক
কিছু-না-কিছু অর্থ আছে। যাহাই আপনি ভাবুন না কেন,

যাহাই আপনার মাথায় পড়ুক না কেন।
অর্থটি সব সময়েই যোগ-করা আছে। মাথার ভিতরেই
হৌক অথবা মাথার উপরেই হৌক,

একটা বেলনের অর্থ আছে, আর-কিছু না-হইলেও
অন্তত এটা যে সে ঘনক্ষেত্র নহে। কোনো ফাটলেরও অর্থ হয়।
অন্তত এটা যে সে কোনো পাহাড়পর্বত নহে।
যে-সব বেলন ঘনক্ষেত্র বলিয়া ভান করে অথবা যে-সব ফাটল
ভান করে তাহারা যেন পাহাড়পর্বত,
তাহাদের গায়ে আঁটিয়া যায় কোনো বিশেষ অর্থ।

সদ্য প্রকাশিত ঃ

বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদ	স্বামী বিদ্যারন্য	৩৫.০০
শ্রীবিজ্ঞান-ভৈরব	ডঃ রামচন্দ্র অধিকারী	৮.০০
Administration of Law and Justic in India	Sri S.N. Bhattacharjee	25.00

Burdwan University
Rajbati. Burdwan
713104

আলোচনা

কবিতায় সমর্পিত

সমর চক্রবর্তী

স্নেহাকর এবং তার কবিতা প্রসঙ্গে তথ্যগত দিক দিয়েই এই আলোচনার সূত্রপাত করা যাক।

তার নিজের লেখা 'আত্মপরিচয়' থেকে জানা যায়, দেশভাগের ফলে যে সাউথ সুবারবন ব্রাঞ্চ স্কুলে ক্লাস টেন-এ ভর্তি হয় এবং সেখান থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে। তার দু-এক বছরের মধ্যেই 'সৈনিক' নামে একটি সাহিত্যপত্রে 'আসমানী' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। আমার ধারণা, কোন সাহিত্যপত্রে, এটাই তার প্রথম মুদ্রিত কবিতা। এই কবিতার একটি পংক্তিও আমার মনে নেই। এর পরে, প্রায় বছর খানেকের মধ্যে বেহালা কিংবা সরশুনা থেকে প্রকাশিত 'প্রান্তিক' নামে একটি সাহিত্যপত্রে স্নেহাকর 'বাতিঘর' নামে একটি কবিতা লেখে। সেই কবিতার দু-একটা পংক্তি এখনো মনে আছে।

বাতিঘর নিঃসঙ্গ একক নীল তারা
মিলহারা গান নাবিকের।
রক্তের ঘাসের আর ভিজে ভিজে জীবনের সুর……।

আর মনে নেই।

স্নেহাকর লেখক হবে এটা তার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা পনের-ষোল বছর বয়সেই বুঝতে পেরেছিল। বলা বাহুল্য, স্নেহাকরেরও তা অজানা ছিল না। যে সব ঘটনা বা দৃশ্য তার মনে, চেতনায় বিশেষ অভিঘাত সৃষ্টি করতো তার বেশীর ভাগ ঘটনা বা দৃশ্য আমরা যৌথভাবে প্রত্যক্ষ করলেও প্রতিক্রিয়া হত সঙ্গত কারণেই ভিন্নতর।

স্নেহাকরের দুটি কবিতার বইয়ে মোট কবিতার সংখ্যা আশি। 'তৃষ্ণার তমসা'-র চৌত্রিশ এবং 'বধ্যভূমিতে মাতলামি'-তে আছে ছেচল্লিশটি কবিতা।

বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত অথচ গ্রন্থিত হয় নি এমন কবিতার সংখ্যা খুব বেশী করে ধরলেও একশোর বেশী হবে বলে মনে হয় না। অগ্রন্থিত কবিতার মধ্যে কিছু আছে ডিলান টমাসের অনুবাদ আর প্রায় সদ্য নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি ওডিসি এলাইটিসের একটি কবিতা। যেটা মযুখে ও অনুবাদ করেছিল প্রায় সাতাশ আটাশ বছর আগে। এ থেকেই বোঝা যায় তার সমসাময়িক কবিদের তুলনায় এক দশমাংশ কবিতাও লিখেছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমি ভালো করেই জানি, মনে মনে লিখেছে প্রকাশিত কবিতার দশগুণেরও বেশী। প্রকাশ করেনি। কারণ, লেখার আর্ট যেমন সে আয়ত্ব করেছিল, তেমনই করায়ত্ব করেছিল না-লেখার আর্ট। এর ফলশ্রুতি এই, তার সমকালে হয়তো কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি ত্রুত স্মরণীয় কিংবা অবিস্মরণীয় কবিতা লেখার এবং শব্দের মধ্যে বিদ্যুত সংযোগে নানা কোণ থেকে নানা বর্ণের আলেকসম্পাতের দক্ষতায়।

স্নেহাকরের কবিতায় সার্ত্র, কিয়েৰ্কেগার্ড, ব্লেক, ডিলান টমাস, এদের প্রভাব কতখানি কিংবা স্যুররিয়ালিষ্ট চিত্রশিল্পের প্রভাবে তার কবিতার চিত্রকল্পগুলি কতখানি প্রভাবিত—প্রভৃতি বিষয়গুলি ডক্টরেট অভিলাষী গবেষকদের জন্য জমা থাকুক। আমি এই ধরণের আলোচনার বিরুদ্ধে নই কিংবা এর প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করিনা। কিন্তু আমার কাছে কবিতার উৎকর্ষের প্রথম ও শেষ সর্তই হলো, সংবেদনশীল বিদগ্ধ পাঠকমনকে তা কতখানি আলোড়িত করতে পেরেছে? কতখানি আক্রান্ত হয়েছে পাঠকের মন? তার ব্যাপকতা ও গভীরতা কতদূর? স্নেহাকরের কবিতার পাঠকদের বিনীতভাবে একটি অনুরোধ করছি। প্রথমেই যেন তারা 'বধ্যভূমিতে মাতলামি'র 'উন্মাদের মতো যেন' কবিতাটি পাঠ করে তারপর অন্য কবিতা পাঠ করেন। কারণ, আমার মনে হয়, স্নেহাকরের কাব্যলোকে প্রবেশের সংকেত এই কবিতায় বিধৃত। তার কাব্যচেতনা ও কবিতার মূল নিয়ন্ত্রক শক্তি, তার অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির পৃথিবী, যে পৃথিবীতে জন্ম, জীবন, মৃত্যু প্রেম এখনো রহস্যময় এবং এই পৃথিবীর শত শত শতাব্দীর সঙ্গে তার চেতনার একাত্মবোধ। এ ছাড়া অন্য কোন কষ্ট আরোপিত দার্শনিক মতবাদের কুয়াশায় আবরণে আচ্ছাদিত নয়। স্নেহাকর তার পাঠককে যে চেতনার লোকে আহ্বান করে সেখানকার আনন্দ যেমন তীব্র বেদনাও তেমনি সীমাহীন।

একসময় স্নেহাকর হয়তো ভেবেছিল, আদিকবির মতই তার শায়কবিদ্ধ হৃদয়ের তৃষ্ণা মিটবে তমসার পুণ্যবারিধারা পান করে :

যে সব রমণী এই পৃথিবীকে ঈশ্বরের প্রিয় উপহার
যাদের হৃদয়ে প্রেম-ভালোবাসা-শক্তির অনন্তমূল আছে
তারা কেউ আসে যদি, আমার এ তৃষ্ণার তমসা
স্রোতস্বিণী নদী হয়—স্নান করে দেবকন্যাগণ
সারারাত ঢেউয়ের চূড়ায়
ফুলে দূর্বা-গন্ধমালা-ভেসে ভেসে যায়!
(আমি এই অন্ধকারে। তৃষ্ণার তমসা।)

কিন্তু তা হওয়ার নয়—
·····এই যুগান্তের তামস দেবতা
কখনো করেনা ক্ষমা আমাদের নশ্বর ভাস্বর আকুলতা।
প্ররোচিত সহোদর অন্ধকার এসে
শহরের সন্ধ্যার পাশায়
আমাকে আহ্বান করে! পাশাবতী বিদ্রূপে কৌতুকে
টলোমলো অমার আস্বাদে
তোমার সকল স্মৃতি প্রেম এই পৃথিবীর উত্তরাধিকার
পণ রেখে হেরে যাই আমি·····।
(প্রেমের সময় হলো। তৃষ্ণার তমসা।)

এর ফলে সে তার চিরন্তণী প্রিয়তমাকে মুক্তি দেওয়ার নামে পরিত্যাগ করলো। কিংবা বলি নিজেই পালিয়ে এলো। যদিও সে ভালোকরেই জানে, নিষাদ-কলকাতা তার মুখের দিকে লালাঝরা কামার্ত চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকবে। আর এই ভয়াবহ পরিণতির কথাও অনেক অনেক আগেই কবি বা দ্রষ্টার চোখ এড়ায়নি—

তোমার নয়নে চৈত্রের
পুঞ্জ পুঞ্জ দ্রাক্ষার সুরায়
যদিও অরণ্যচারী এই
পথক্লান্ত হৃদয় জুড়ায়।

তবুও বিহ্বল হয়ে আমি

দেখেছি তোমার চোখে, নারি—
চতুরঙ্গ সৈন্যের মিছিল
নিয়তির ক্ষিপ্র তরবারি!
(সীতার জন্যে। তৃষ্ণার তমসা।)

চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে স্বাধীনতা আন্দোলন, ভয়াবহ মন্বন্তর, স্বাধীনতা লাভ ও দেশ বিভাগের আনুষঙ্গিক পরিণতি ও প্রতিক্রিয়া তার চেতনায় একটি নতুন অভিযোজন। এর কোন তাৎক্ষণিক বহিঃপ্রকাশ ঘটার মত বয়স ও শক্তি তখনো তার হয় নি। এরপর চল্লিশ দশকের শেষদিকেই পৃথিবী জুড়ে মানুষের সমস্ত শুভ মূল্যবোধের অবক্ষয়ের লক্ষণগুলো অস্বাভাবিক দ্রুতভাবে প্রকট হতে থাকে। ফেটে বেড়িয়ে আসতে থাকে অসুস্থতার, মস্তিষ্ক বিকৃতির ও পচনের বীভৎস চিহ্নগুলি। এই সমস্ত কিছুর প্রতিক্রিয়ায় তার ইন্দ্রিয় মন ও চেতনা ধনুকের ছিলার মতো টান টান হয়ে গিয়েছিল। নিজের চারপাশের অবস্থাকে সামগ্রিক এবং বিচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ, তার গূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি এবং সেই উপলব্ধিকে প্রকাশ করার জন্য শব্দকে দুমড়ে মুচড়ে বাঁকিয়ে ভাষার মধ্যে এক অভিনব মাত্রা যোজনার ফলেই তার কবিতা এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত। যাকে T. S. Eliot বলেছেন, Verbal equivalent for states of mind and feelings. মানুষের অর্থহীন অস্তিত্বের শূন্যতা ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা তাকে এমন এক উপলব্ধিতে নিয়ে গেছে যেখানে বেঁচে থাকার অর্থ নিজের শব নিজে বহন করা। নানা ঘাত প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব-সংঘাতে তার চৈতন্য এমন এক জায়গায় উপস্থিত, সেখানে তার এক করতলে ঘৃণা অন্য করতলে পাপক্ষয়কারী শোণিত মোক্ষণ। এই সমস্ত অবস্থা ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষায় শুধু কবির কেন, যে কোন সচেতন মানুষের কাছে আজকের পৃথিবীকে বধ্যভূমি ছাড়া আর কি মনে হতে পারে? এর পরেও যখন মানুষ ক্ষমতা, অর্থ উচ্চাভিলাষ-এর পেছনে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পঙ্গপালের মতো ধাবিত হয়, তাকে মাতলামি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? যার ফলে তার নান্দনিক চেতনাও করুণ বিষাদ-বেদনায় আর্ত। এই করুণ বিষাদ-বেদনা থেকেই সে তার মনে অর্জন করেছিলো এক অসাধারণ নিরাসক্তি এবং বিকারহীন বীক্ষণের। সে স্থির বুঝতে পেরেছিলো—

যদিও প্রতিটি দিনের
আকাঙ্ক্ষা ক্রোধ হিংসা মৃত্যুর ইচ্ছা

আঘাত বিশ্বাসহীনতা পাপ ও পতন প্রেম উন্নতি-সব কিছুতেই
জন্মকালীন বিষ্ঠার গন্ধ লেগে আছে,……
……জীবনধারণের
সমস্ত ব্যাপারটাই তবে বধ্যভূমিতে মাতলামি!…
(আমি ব্যাধ হয়ে। বধ্যভূমিতে মাতলামি।)

এবার কয়েকটি কবিতার কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পংক্তি পাঠকের সামনে উপস্থিত করছি এই কবিতাগুলির মূল কেন্দ্রবিন্দু প্রেম। এই প্রেম একই সঙ্গে লৌকিক এবং অলৌকিক, শরীর ও আত্মার যৌথ প্রতিক্রিয়ায় আর্তকণ্ঠের নায়কী এবং স্বর্গীয় উচ্ছ্বাস:

'……কবে একদিন
তোমার অশ্রুর মধু পান করে চুমুকে চুমুকে
মত্ত দেবতার মতো সকলি সহজলভ্য মনে হয়েছিল
আত্মঘাতী অহংকারে। আজ সেই অশ্রুর প্রদাহে
তিষ্ঠাতে পারিনা আর! তুমি প্রেম চিরদিন ম্লানা মহীয়সী…
(এখনো ঘুমের মধ্যে। তৃষ্ণার তমসা।)

'প্রিয়তমা, ভালোবেসে ক'জনের ভালো হয়?
পবিত্র পিপাসা প্রেম আকুলতা নিয়ে তবু জটিল নিয়মে
আমরা উন্মাদ পঙ্গু ক্রিয়াশীল শবদেহ বিষণ্ণ ঘাতক।'
(আমিই সে ফেরারী ঘাতক। তৃষ্ণার তমসা।)

'তুমি এনেছিলে আকাশ। আমিও উজ্জ্বল থোকা থোকা
তারার আঙুর নিংড়ে গোপনে স্বর্গের সোমরস
তৈরি করেছি। উৎসব কবে ভেঙ্গে গেছে তবু জ্বলে
বুকে ও গলায় নক্ষত্রের নীল আগুনের দাহ!
ঋতু বদলায়। শুধু আজও অন্তরে
খুব ভোরবেলা স্মৃতি ও শেফালি ঝরে!'
(হাতে হাত রেখে। বধ্যভূমিতে মাতলামি।)

'কী আছে তোমার কাছে বলো,

ভালোবাসা? ডাকো তবে ডাকো—
নদী হয়ে সমুদ্রের দিকে
চলে যাই প্রণামের মতো!'
(কী আছে তোমার কাছে। বধ্যভূমিতে মাতলামি।)

আর 'ভালোবাসা' নামে কবিতাটি—এই একটি কবিতাই যে কোন কবিকে অমরতার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার শক্তি ধরে।

এই সমস্ত কবিতা, তার কবিতায় সমর্পিত হৃদয় মন প্রাণ আত্মা থেকে যে মর্মভেদী হাহাকার এবং তীব্র আনন্দের উৎসরণ হয়েছিল, সেগুলিকেই সে সংকলিত করেছে 'তৃষ্ণার তমসা' এবং 'বধ্যভূমিতে মাতলামি'র সমস্ত কবিতায়। তবুও, এর পরেও, পরিকল্পিত অস্বীকৃতি, অনাদর, অবহেলাকে উপেক্ষা করে কবিতার কাছে আত্মসমর্পণের জন্য স্নেহাকর বজ্রকঠিন নিষ্ঠায় রয়েছে অবিচল। এর একমাত্র কারণ, কবিতা তার কাছে এমন একটি শিল্পমাধ্যম-যার মধ্যে সে তার মুক্তি প্রত্যক্ষ করেছিল।

আমাদের সঙ্গে আছে

অজয় নাগ

(কবি স্নেহাকর ভট্টাচার্য স্মরণে)

দরকার নেই শোক প্রস্তাব
আমাদের কাছে উজ্জ্বল আছে এখনো তার স্মৃতি
জোয়ান তাগড়া কবিতার কণ্ঠস্বর…
দুই-একটা বইয়ে যেখানে তার হাতের ছাপ
লেগে আছে, আসুন সেখান থেকে অক্ষর উচ্চারণ করি,
আমরা জানি: আমাদের সঙ্গে মিলে মিশে ছিল সে
আমাদের সঙ্গে ছিল একা একা
একদিন কি কারণে যে উঠে চলে গেল বাইরে!
কেউ কি ডেকেছিল…আবার কি ফিরে আসবে?
এটা ঠিক যারা কবিতা পড়তে চাই—মনে রাখবো তাকে অনুভবে
অগাধ বাতাসে আমাদের পাশে
যেন আমাদেরই ঠোঁটের ফাঁকে
ছাখো তাঁর স্মিত হাসি এখনো লেগে আছে।

কবিতাগুচ্ছ

সুভাষ ঘোষালের কবিতা

গৌতম গুপ্ত

সুভাষ ঘোষাল একজন সাম্প্রতিক তরুণ কবির নাম। দশক হিসাবে তিনি কোন্ দশকে পড়বেন জানি না। তাঁর একাধিক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অনুমান করি অন্তত দশ বছরের অধিককাল ধরেই তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার অন্তর্গত। আমরা তবু শুরুতেই সাম্প্রতিক লিখলাম তার কারণ অতি সম্প্রতি তিনি পাঠকের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

একেবারে শুরুতে তাঁর অনেক কবিতাতেই কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি লক্ষ্য করা যেত। বিশেষত অলোকরঞ্জনের আধ্যাত্মিক ও মিষ্টিক প্রকরণের অনেকটাই তিনি আত্মস্থ করেছিলেন, যদিও তার মধ্যেই তিনি তৈরি করছিলেন নিজের জন্য একটি ব্যক্তিগত সঙ্কেতপন পথ, সে পথের অনেকটাই আমাদের কাছে আজ স্পষ্ট।

সুভাষ মিতকথনের স্মিত সৌন্দর্যের কবি। নিতান্ত অসুন্দর কথাও তিনি সুন্দর করে বলতে শিখেছেন। তিনি প্রকাশ্যে যা বলেন, তার গভীরে না-বলা বাণীর অনেক অনুক্ত ইঙ্গিত তিনি রাখতে পারেন। আর পারেন বলেই তাঁর কবিতার অর্থ এক পাঠে সর্বক্ষেত্রে ধরা দেয় না। বারবার পড়তে হয়।

এখানে সুভাষের আটটি কবিতা প্রকাশিত হলো। বাংলা কবিতার সদ্যতম ধারা থেকে কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্ন এই কবিতাগুচ্ছে পাঠক টাটকা তাজা নতুন স্বাদের কিছু কবিতা পাঠের আনন্দ পাবেন।

সুভাষ ঘোষালের আটটি কবিতা

নিসংরণ নিয়ে

আমার ঝ'রে যাবার সঙ্গে
একজন কুষ্ঠরোগীর ঝ'রে যাওয়া

বা একটি আপেলের ঝ'রে যাবার
তুলনা করা ভুল।
বরং একজন কুষ্ঠরোগীর
অলোক, অবিভাজ্য কুটীর যদি পাওয়া যায়
যদি তার প্রতিবাসী-রূপে পাওয়া যায়
আপেল গাছের লগ্ন
আমার ঝ'রে যাওয়াটা হয়ে দাঁড়াবে
ধর্মগ্রন্থের নিশ্বাস।

বিভাসের দিকে বাড়ি

তুমি বলেছিলে বড়ো হয়ে গেছে হাওয়া
এবারে আবার দেহকেই ফিরে পাওয়া
যে-কোনো সময় সম্ভব·শুধু যদি
হৃদয়ের দিকে উঠে যেতে পারে ধী।

আমি বহুদিন ওঠার বদলে নেমেছি
নামার জন্য এখনও নামতে পারি
প্রতি উতরাই জেনে গেছে আমি কী
আমাকে পায় নি আলোর কর্মচারী।

তুমি বলেছিলে বিভাসের দিকে বাড়ি
দেহ আর হাওয়া যদি বার বার ডাকে
দেখা হবে ঠিক তখনই বলতে পারি
ভাবনা যখন দেখে ফেলে ভাবনাকে।

রজনীপ্রমাণ

তার হাতে ছিল শুদ্ধসত্ত্ব টিয়া
তার পাশে ছিল মাঠ
তাকে চেয়েছিল চৈত্রের চার্বাক
তার দেহ ছিল সাক্ষাৎ শারদীয়া।

আমি তার কাছে যাই নি পুনর্বার

এই যুগান্তে আমার পুত্র যাবে
পুত্রের দ্বারা সে হয়তো ঠিক তার
রজনীপ্রমাণ রাজত্ব খুঁজে পাবে।

অভিরতিহীন

স্বাধীন সাইকেলে শিশুদের নাম লেখা।

বড়ো রাত
উঠে যাও বড়ো রাতে
করতললিপ্ত লেবু (লেবুর লাঘব ?)
গিনিপিগস্নিগ্ধ কোল।

মন-খারাপ-করা সুন্দর
মন-খারাপ-করা দাঁড়ানো তোমার শস্যচূড়ায়।

আর কতদিন
সাইকেলে নামী শিশুদের ভাবীকালবিষয়ক
লেলিহান
অভিরতিহীন
তমি ?

যা-কিছু দ্বিপ্রহর

ঘরের মধ্যে হেঁটে বেড়ায় উঁচুদরের মজুর।
তার পেছনে কুকুরের ছায়া
তার পেছনে যে দেহের মীমাংসা হয়ে গেছে
সেই দেহাশ্রিত শাড়ী।

যা-কিছু দ্বিপ্রহর
এইভাবে মাথা তোলার আগেই
তোমার অর্গানের সামনে গিয়ে দাঁড়াব।

আমি চিরদিন অমীমাংসিত— এই বিজ্ঞানে
এবারেও অশ্রুপাত করো ?

সেই প্রথম

ঘরের মধ্যে একদিন শুরু করা হয়েছিল ধানচাষ।

সোফাপুঞ্জের পাশে অনাঘ্রাত শ্রম
সিন্দুকের পাশে দায়িত্বের ভেদরেখা
আর বিছানায় সৌরলোক ?

ঘরের মধ্যে সেই প্রথম
বিফল হয়েছিল প্রয়াস
পৃথিবীতে একবার কাস্তের আকারে
উঠে এসেছিল বিফলতা।

পূর্ণিমায়

ফুটে উঠেছে সব ধরনের পথে সব ধরনের বরফ।
বেরিয়ে পড়েছে সব ধরনের ঝাঁপি থেকে
সব ধরনের গন্ধরাজ।
নৌকোয় রুদ্রবীণা তুলে
নানা সরস্বতী ঝাঁপ দিল
ঝাঁপ দিচ্ছে।
ঠোঁট উঠে আসছে বাদ্যযন্ত্র থেকে বাতাসে।
সমস্ত কাহিনীর চারিধারে দাঁড়িয়ে
আমি ঠিক করতে পারছি না
কোন্ দিক দিয়ে জীবনে প্রবেশ করব
আমি ঠিক করতে পারছি না
আমি প্রবেশ করার আগে
আমার সমস্ত রকম পিতার হাত ধ'রে
আমার সমস্ত রকম পুত্র
আমাকে কী প্রশ্ন করবে ?

মাধবী

পুরু গদির ওপর পাতা ঝরছে পদ্মের
টলমল করে ওঠে কলমের স্বর্ণমুখ

টলমল করে ওঠে কলমের স্বর্ণমুখ

শীত ও গ্রীষ্মের কবিরা ঘোড়া ছেড়েছে মাঠে

সুন্দর শুধুমাত্র সুন্দর নয়
সুন্দর শুধুমাত্র সুন্দর নয়

সিংহের কোল থেকে উঠে আসছে ভাস্কর

শক্তি কখনও কখনও সত্যের
শক্তি কখনও কখনও সত্যের

নীল ফিরিয়ে দিচ্ছে দেবতার পাণ্ডুলিপি

টলমল করে ওঠে কলমের স্বর্ণজল
টলমল করে ওঠে কলমের স্বর্ণজল ॥

ব্যক্তিগত রচনা

আমি জানি না, আপনারা জানেন ?

সুধীর মুখোপাধ্যায়

প্রথম দৃশ্য : চাকুরি থেকে অবসর নিয়েছি। অখণ্ড অবসর। ভেবেছিলাম শেষ ক'টা দিন অনায়াস আয়েসে কাটিয়ে যাব। কিন্তু না, অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। অফিসের চিন্তা গেলেও সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক চিন্তাগুলি তো করে যেতে হবে। শুধু চিন্তা করেই তো সকলে দেশোদ্ধার করছে। মনকে কত বোঝাই—অনেক তো হ'ল, আর কেন ? চিন্তা করার কি আছে, পৃথিবীতে ক'টা দিন আর। পার তো পরকালের কথা ভাবো। আসলে চিরদিন সবচেয়ে যে কাজটা সহজ সেই সহজ কাজটাই ক'রে এসেছি, প্রাণভরে অন্যকে উপদেশ দেওয়া। যদিও অন্যের উপদেশে কোনোদিন কর্ণপাত করি নি। শ্রমহীন দেহে ঘুমও আসে না সহজে। নিতান্ত বিরক্ত হয়েই সেদিন একসঙ্গে গোটা-দুই ঘুমের বড়ি খেয়ে বিছানায় চিৎ হলাম। খাঁটি বড়ি, কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমে চোখটা জড়িয়ে এলো।

দ্বিতীয় দৃশ্য : হঠাৎ দেখি একটা পুরনো বটগাছের তলায় কজন উঁচু সমাজপতি (বড়ো টিকি দেখে মনে হলো) অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে কি একটা আলোচনা করছে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই কানে এল, "দেখলে ভাই, মুসলমানেরা দেশটার শেষ করে দিল, সনাতন হিন্দুধর্ম আর রইল না। আরে, তুই হলি গিয়ে দিল্লীর বাদশা, তুই পর্যন্ত হিন্দু মেয়েদের শাদী করে বসলি ? এর পর তো তোর চেলা-চামুণ্ডারাও আরম্ভ করবে ?" আর একজন পর্বত-প্রমাণ নস্য অতিকায় নাসিকায় চালান করে দিয়ে বলে উঠলেন— যা বলেছ ভায়া দেশটা উচ্ছন্ন গেল, ভাবছি সপরিবারে দাক্ষিণাত্যের দিকে যাত্রা করব। দক্ষিণে এখনো ধর্ম আছে। একজন তালপত্রের পুঁথিগুলি গোছগাছ করে তুলছিলেন। তার কণ্ঠে শোনা গেল, "তা ভাই হজরতপুত্রদের দোষও যেমন আছে, গুণাগুণও কম নেই। কেউ কেউ রামায়ণ, মহাভারত অনুবাদে সাহায্য করে জনসাধারণের উপকারও তো করেছে, তা ছাড়া বাদশাহের হিন্দু সেনাপতি,

মন্ত্রী, কর্মীরাও তো হিন্দু।" পূর্বোক্ত পণ্ডিত এ-হেন অসাম্প্রদায়িক কথাবার্তায় চটে গিয়ে বললেন— রাখো হে, এই তোয়াজ করে করেই দেশটাকে তোমরা ডোবালে, নাও চলো— সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় হয়ে গেল। হাঁ, চলো দাদা— আর আহ্নিক! কলির সন্ধে হয়ে দেশটা উচ্ছন্নে গেল? এসব বলতে বলতে লোকগুলি যেন হঠাৎই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ভালো করে চোখ মুছে দেখি— না মেলায়নি লোকগুলি বটগাছের তলায়ই বসে আছে। তবে এবার খালি গায়ে নয়, চাদরের মতো কি একটা গায়ে চাপিয়েছে। সেই বয়োজ্যেষ্ঠ সমাজপতি ভদ্রলোকই তারস্বরে শুরু করলেন, "আর বলো না, বুঝলে বাচস্পতি, দেশটা যে রসাতলে গেল, আর ঐ নিমাই পণ্ডিত! নেড়ানেড়ীদের দিয়ে কি কাণ্ডটাই না করছে, জপ, তপ পূজা পার্বণের কোনো দাম নেই, নাম করলেই সব শুদ্ধ! সাদা, কালো, বাদামী, হলুদ দেশী বিদেশী সবার হাতেই খোল কর্তাল। অপদার্থ, বুঝলে হে, অপদার্থ, জাতধর্ম আর রইল না।" বাচস্পতি বলে উঠলেন— যা বলেছ ভাই।

তৃতীয় দৃশ্য: একঘেয়ে কথাগুলি শুনতে শুনতে ঝিমুনি এসেছিল, হঠাৎ ন্যায়রত্নমশাই-এর চিৎকারে ভালো করে চোখ খুলে দেখি বটগাছটি একটি বাড়ির বৈঠকখানায় রূপান্তরিত হয়েছে। সমাজপতিদের-গায়ে বেনিয়ান-জাতীয় একটা পোশাক; কারোর বা পশমী চাদর। সুগন্ধি তামাকের ধোঁয়ায় স্থানটি পরিপূর্ণ। ন্যায়রত্ন মশাই একনাগাড়ে চিৎকার করেই যাচ্ছেন— "দেখলে তো তখনি বলেছিলাম— রামমোহনটা সতীদাহ প্রথা রহিত করে হিন্দুধর্ম তো প্রায় শেষ করে দিয়ে গেছে এবার বাকিটুকু শেষ করতে এগিয়ে এসেছে তোমাদের বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র।" তৎক্ষণাৎ আর-একজনের ফোঁড়ন: "যা বলেছ ভায়া, ঈশ্বর ভালো ঈশ্বরকেই তৈরি করেছিল, একজন বন্ধ করলেন সতীদাহ, আর-একজন শুরু করলেন বেধবার বিয়ে।"

বাচস্পতি মশাই আরও একটু গলা উঠিয়ে বললেন, "তাছাড়া ওই দত্ত বাড়ির ছেলেটার কথা শুনেছ? ঐ যে গো মধু— মধুরসূদন না কি পদ্য লেখে, ওটা নাকি খেরেস্টান হয়েছে। সশব্দে একটিপ নস্যি নাকে দিয়ে ন্যায়রত্নের উত্তর "আর বল না—ম্লেচ্ছ-ম্লেচ্ছ! দেশটা উচ্ছন্নে গেল, বুঝলে হে, দেশটা গেল?" খুব আস্তে চাপা গলায় একজন বললো "কোথায়?"

চতুর্থ দৃশ্য: অনেকক্ষণ ধরেই মেঘ গুরুগুরু করছিল। ঝড় এল। ঝড়-ঝাপটার পর চোখ খুলে দেখি আকাশ অনেকটাই পরিষ্কার।

বাচস্পতি, ন্যায়রত্ন প্রভৃতি সমাজপতিগণের চেহারাতেও যেন নূতন করে চেকনাই লেগেছে। পাঞ্জাবি, ধুতি, চাদর, কুর্তা অনেকেরই অঙ্গে শোভা বর্ধন করছে। তাম্রকুটের সঙ্গে সিগারেট আমদানিও শুরু হয়েছে। চশমার কাচ পরিষ্কার করতে করতে ন্যায়রত্ন শুরু করলেন— "ভায়া শুনেছ, বোমা পিস্তল নিয়ে ছেলেগুলি ইংরেজ তাড়াতে লেগেছে। আরে বাবা মহারানীর রাজত্বে সূর্য্যি অস্ত যায় না— আর তোরা গেছিস মামদোবাজি করতে?"

ক্ষেপে গিয়ে বাচস্পতি মশাই বলে উঠলেন, "আরে বাবা, ওরা হল গিয়ে রাজসিক মানে রাজার জাত। ধরছে আর ফাঁসিতে লটকাচ্ছে। বখা ছোকরা তোরা কটা বোমা পটকা ছুঁড়ে ইংরেজ তাড়াবি, লাভের মধ্যে ভালো শান্ত ছেলেছোকরাগুলির মাথা নষ্ট। দেশটা, বুঝলে হে, দেশটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে।"

শেষ দৃশ্য: উচ্ছন্নে যাওয়া সম্বন্ধে বোধহয় কারও দ্বিমত ছিল না। আমিও আড়ালে গিয়ে (এরা প্রায় গত দেড় শতাব্দীর গুরুজন তো) প্রাচীন বিড়িটায় সুখটান মেরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আবার ফিরে আসতেই দেখি ফুঁসমন্তরে বৈঠকখানাটা একটা আধুনিক ড্রয়িংরুমে পালটে গেছে। ন্যায়রত্ন-বাচস্পতিরা কেউ থ্রি পিস্ স্যুট, কেউ বা টুপিস্ পরে আছেন, টিকি নেই। অবশ্য মিথ্যে বলব না, কিছু কিছু ধুতি পাঞ্জাবি হাওয়াইন সার্টও আছে। সামনে নামী দামী, দিশি বিলিতি সিগারেট। কেউ কেউ গ্লাসে সোডা মিশিয়ে মাঝে মাঝে কি যেন পান করছেন। কয়েকজন এর মধ্যেই খবরের কাগজ হাতে উত্তেজিত ক্ষিপ্ত আলোচনায় ব্যস্ত। কাছে যেতেই কানে এল, "দেখছেন মিঃ সেন আজকের কাগজেও দশটা মার্ডার, বিদ্যাসাগরের মূর্তির গলা কেটে নিয়েছে? দেশের এ কি হাল হ'ল? এ্যাঁ এজন্যই কি কানাইলাল, প্রফুল্ল চাকি, ক্ষুদিরাম হাঁ?" দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিঃ সেন বলে উঠলেন, যা বলেছ ভাই, উচ্ছন্নে গেল, দেশটা উচ্ছন্নে গেল। এমন সময় একটা বোমা পাখির মতো উড়তে উড়তে এসে ঘরটার মধ্যেই দুম করে ফেটে গেল। চিৎকার হৈ-চৈ এর মধ্যে স্লিপিং পিলের নকল ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ খুলে দেখি নাত্‌নী এসে জানালাটা খুলে দিয়েছে। অনেক দেশ কাল সময়, বহু সত্য মিথ্যা, আসল নকল পেরুনো এক ঝলক ঝল্‌মলে রোদ ঘরে ঢুকে পড়েছে। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম— কিন্তু রাতের ছবিগুলি তখনও মাথা থেকে নামে নি। আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা কথাই মনে এল— দেশটা কি সত্যিই উচ্ছন্নে গেছে বা যাবে?

পুরাতনী

ডমরু-চরিত

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূচনা

ডমরুধর বলিলেন,—"এই যে দুর্গোৎসবটি, এটি তোমরা সামান্য জ্ঞান করিও না। কিন্তু এখনকার বাবুদের সে বোধ নাই। বাবুরা এখন হাওয়া-খোর হইয়াছেন। দেশে হাওয়া নাই, বিদেশে গমন করিয়া বাবুরা হাওয়া সেবন করেন, আর বাপ পিতামহের পূজার দালান ছুঁচো-চামচিকাতে অপরিষ্কার করে।"

লম্বোদর বলিলেন,—"সত্য কথা! সেকালে পূজার সময় লোকে বিদেশ হইতে বাড়ী আসিত। বন্ধু-বান্ধবের সহিত মিলিত হইত। যাহার যেমন ক্ষমতা মায়ের পূজা করিত, গরীব-দুঃখীরা অন্ততঃ একসরা খয়ে-মুড়কি ও দুইটা নারিকেল-নাড়ু পাইত।"

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—"শুনিয়াছি যে, কলিকাতায় পূজা করা এক নূতন ব্যবসা হইয়াছে। একটি প্রতিমা খাড়া করিয়া বন্ধু-বান্ধবদিগকে লোক নিমন্ত্রণ করে, পরে তাহাদের কান মলিয়া প্রণামী আদায় করে। পূজা করিয়া অনেকে দুই পয়সা উপার্জন করে।"

ডমরুধর বলিলেন,—"তাহাতে আর দোষ কি? পূজার সময় আমি আমার আবাদের প্রজাগণকে নিমন্ত্রণ করি। ভক্তিভাবে মায়ের পাদপদ্মে তাহারা যদি কিছু প্রণামী প্রদান করে, তাহাতে আর আপত্তি কি? যাহা হউক, বিলক্ষণ ঠেকিয়া এই দুর্গোৎসবটি আরম্ভ করিয়াছি। আমি এখন বুঝিয়াছি যে, ভগবতীর আরাধনা করিলে ধনসম্পদ্ হয়।"

পুরোহিত বলিলেন,—"তে সন্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং, তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্মবর্গঃ। হে দেবী! তুমি যাহার প্রতি কৃপা কর, জনপদে সে পূজিত হয়; তাহার ধন ও যশ হয়, তাহার ধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকে।"

কলিকাতার দক্ষিণে একখানি গ্রামে ডমরুধরের বাস। প্রথম বয়সে তিনি নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। অনেক কৌশল করিয়া, সাধ্যমতে একটি পয়সা খরচ না-করিয়া তিনি এখন প্রভূত ধনশালী হইয়াছেন। অন্যান্য সম্পত্তির মধ্যে সুন্দরবনের আবাদে তাঁহার এখন বিলক্ষণ লাভ হইয়াছে। ডমরুধর এখন পাকা ইমারতে বাস করেন। পূজার পঞ্চমীর দিন সন্ধ্যার পর দালানে, যে স্থানে প্রতিমা হইয়াছে, সেই স্থানে গল্পগাছা প্রসঙ্গে এইরূপ কথাবার্তা হইতেছিল।

ডমরুধর পুনরায় বলিলেন,—"হাঁ! মা আমাকে ঘোরতর বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই বিপদে পড়িয়া, একান্ত মনে মাকে ডাকিয়া আমি বলিয়াছিলাম, 'মা! তুমি আমাকে এ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর। তাহা করিলে প্রতি বৎসর আমি তোমার পূজা করিব'।"

লম্বোদর বলিলেন,—"তুমি তো কেবল তিন বৎসর পূজা করিতেছ। এ তিন বৎসরের ভিতর তোমাকে তো কোন বিপদে পড়িতে দেখি নাই। বরং তিন বৎসর পূর্বে এই বৃদ্ধবয়সে তুমি নূতন পত্নী লাভ করিয়াছ।"

ডমরুধর বলিলেন,—"তিন বৎসর পূর্বে আমি ঘোরতর বিপদে পড়িয়াছিলাম। তৃতীয় পক্ষ বিবাহের সময় আমি সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিলাম। গ্রামের লোক, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব কেহই সে কথা জানে না। মুখ ফুটিয়া আজ পর্যন্ত কাহারও নিকট সে কথা আমি প্রকাশ করি নাই। মা জগদম্বা আমাকে সে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। দুর্গতিনাশিনী দুর্গার প্রতি লোকের ভক্তি ক্রমে লোপ হইতেছে। কলেরা ম্যালেরিয়া বসন্ত প্লেগ তো আছেই, মায়ের প্রতি ভক্তির অভাবে এখন আবার ফুলো রোগ দেখা দিয়াছে ঘুমন্ত রোগও আসিয়াছে। জগদম্বার প্রতি ভক্তি থাকিলে লোকের এ সব বিপদ্ হয় না।"

পুরোহিত অপরিস্ফুট স্বরে বলিলেন,—

"দুর্গে! স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ,
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি॥
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি! কা ত্বদন্যা,
সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥"

হে দুর্গে! বিপদে পড়িয়া তোমাকে স্মরণ করিলে জীবগণের ভয় তুমি দূর

কর। সুস্থ অবস্থায় তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি তাহাদের মঙ্গল কর। যে দারিদ্র্যদুঃখহারিণি! সর্বপ্রকার উপকার করিবার নিমিত্ত তুমি ভিন্ন দয়ার্দ্র-চিত্তা আর কে আছে?"

লম্বোদর বলিলেন,—"কিন্তু বিপদটা কি? কি বিপদে তুমি পড়িয়াছিলে?"

ডমরুধর বলিলেন,—"এতদিন পরে সে বিপদের কথা আজ আমি প্রকাশ করিতেছি, শুন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠিক কন্দর্প পুরুষ কি

ডমরুধর বলিলেন,—"আমার তৃতীয় বিবাহের সময় এ বিপদ্ ঘটিয়াছিল। আমার বয়স তখন পঁয়ষট্টি বৎসর। এত বয়সে লোক বিবাহ করে না। তবে আমার ছেলে-বেটা মানুষ হইল না। আমি তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিলাম। কোথায় সে চলিয়া গেল। সে একটি স্বতন্ত্র গল্প।"

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—"সে গল্প আর একদিন হইবে।"

ডমরুধর বলিলেন,—"তাহার পর বিবাহ না-করিলে গৃহ শূন্য হইয়া থাকে। কিন্তু বিবাহ করিলেও কি হয়, তা জান তো লম্বোদর?"

লম্বোদর উত্তর করিলেন,—"খ্যাচ খ্যাচ, রাত্রি দিন খ্যাচ খ্যাচ।"

ডমরুধর বলিলেন,—"হাঁ, তুমি ভুক্তভোগী। ঘটনাচক্রে আমার এই বিবাহের কথা স্থির হইয়াছিল। আমডাঙ্গার মাঠে আমার যে বৃহৎ বাগান আছে, বৎসর বৈশাখে মানে সেই বাগানে গিয়া আমি ডাব পাড়াইতেছিলাম। দুই চারি দিন পূর্বে আমার পুরাতন উড়ে মালী দেশে গিয়াছিল, ভাইপোকে তাহার স্থানে রাখিয়া গিয়াছিল। সে আমাকে কখন দেখে নাই, আমি তাহাকে কখন দেখি নাই। উদ্ধব ঘোষের জামাতা সেই ছোঁড়ার সহিত সড় করিয়া চোর বলিয়া আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল। তাহার পর মারিতে মারিতে কুতবপুরের মহকুমাতে আমাকে লইয়া গেল। কিন্তু সে আবার একটি স্বতন্ত্র গল্প।"

শঙ্কর ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই বিপদ?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"রাম রাম! এ সামান্য কথা। ইহা অপেক্ষা

ঘোরতর সঙ্কটে আমি পড়িয়াছিলাম। সেই সঙ্কট হইতে মা দুর্গা আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ডমরুধর পুনরায় বলিলেন,—"কুতবপুরে ঘটকীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, পুনরায় বিবাহ করিতে সে আমাকে প্রবৃত্তি দিল। আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। বিবাহের কথাবার্তা চলিতে লাগিল। টাকায় কি না হয়? বাঁশপুরে এক বয়স্থা কন্যায় সহিত বিবাহ স্থির হইল। তিনিই আমার বর্তমান গৃহিণী।"

লম্বোদর বলিলেন,—"সে কথা আমরা জানি, আমরা বরযাত্র গিয়াছিলাম।"

ডমরুধর বলিলেন,—"কন্যার মাতা-পিতা অর্থহীন বটে, কিন্তু আমার নিকট হইতে নগদ টাকা চাহিলেন না। তবে ঘটকী বলিল যে, বিবাহের সমুদয় খরচা আমাকে দিতে হইবে এবং কন্যার শরীরে যেখানে যা ধরে, সেইরূপ অলঙ্কার দিতে হইবে। তোমরা জান যে, আমি কখন একটি পয়সা বাজে খরচ করি না। লোক পাছে অলস হইয়া পড়ে সেই ভয়ে ভিখারীকে কখন মুষ্টিভিক্ষা প্রদান করি না। সেক্‌রার পেট ভরাইতে প্রথম আমি সম্মত হইলাম না। আমি বলিলাম যে, গহনার পরিবর্তে কন্যার আঁচলে নোট বাঁধিয়া দিব। কিন্তু কন্যার মাতা-পিতা সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। অবশেষে আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, আমার বয়স পঁয়ষট্টি বৎসর, তাহার পর আমাকে দেখিয়া কেহ বলে না যে, ইনি সাক্ষাৎ কন্দর্প-পুরুষ। নিজের কথা নিজে বলিতে ক্ষতি নাই,—এই দেখ, আমার দেহের বর্ণটি ঠিক যেন দময়ন্তীর পোড়া শোউল মাছ। দাঁত একটিও নাই, মাথার মাঝখানে টাক, তাহার চারিদিকে চুল, তাহাতে একগাছিও কাঁচা চুল নাই, মুখে ঠোঁটের দুইপাশে সাদা সাদা সব কি হইয়াছে। এইসব কথা ভাবিয়া গহনা দিতে আমি সম্মত হইলাম। যতদূর সাধ্য সাদা-মাটা পেটা সোনার গহনা গড়াইলাম; কিন্তু তাহাতেও আমার অনেক টাকা খরচ হইল। ফর্দ অনেক। একবাক্স গহনা হইল।"

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—"তা বটে। কিন্তু বিপদটা কি?"

ডমরুধর বলিলেন,—"ব্যস্ত হইও না। শুন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গাছে-ঝোলা সাধু

ডমরুধর বলিলেন,—"গ্রামের প্রান্তভাগে বিন্দী গোয়ালিনীর যে ভিটা আছে, সে জমি আমার। কিছুদিন পূর্বে বিন্দী মরিয়া গিয়াছিল। তাহার চালাঘরখানি তখনও ছিল। দুইজন চেলা সঙ্গে কোথা হইতে এক সাধু আসিয়া সেই চালাঘরে আশ্রয় লইল। সে সাধুকে তোমরা সকলেই দেখিয়াছ, তাহাকে সকলেই জান। সাধুর দুইটি চক্ষু অন্ধ। চেলারা বলিল যে, তাহার বয়স পাঁচশত তিপান্ন বৎসর। চালাঘরের সম্মুখে যে আমগাছ আছে, চেলারা তাহার ডালে সাধুর দুই পা বাঁধিয়া দিত। প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক ঘণ্টাকাল নীচের দিকে মুখ করিয়া সাধু ঝুলিয়া থাকিত। চারিদিকে হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। যাহারা বি-এ, এম-এ পাস করিয়াছে, সেই ছোঁড়ারা আসিয়া সাধুর কেহ পা টিপিতে লাগিল, কেহ বাতাস করিতে লাগিল, সকলেই পাদোদক খাইতে লাগিল। একখানি হুজুগে ইংরেজী কাগজের লোক আসিয়া সাধুকে দর্শন করিল ও তাহাদের কাগজে সাধুর মহিমা গান করিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে লাগিল। ফল কথা, দেশের লোকের ভক্তি একেবারে উথলিয়া পড়িল। সাধুর মাথার নিম্নে চেলারা একটি ধামা রাখিল; সেই ধামায় পয়সা-বৃষ্টি হইতে লাগিল।"

লম্বোদর বলিলেন,—"তুমিও সেই হুজুগে দু'পয়সা লাভ করিয়াছিলে!"

ডমরুধর বলিলেন,—"সে জমি আমার, সে চালা আমার, সে আমগাছ আমার; কেন আমি লাভ করিব না? আমি সাধুকে গিয়া বলিলাম,—'ঠাকুর! সন্ন্যাসী মোহান্তের প্রতি আমার যে ভক্তি নাই, তাহা নহে। তবে কি জান, আমি বিষয়ী লোক। তুমি আমার জমিতে আস্তানা গাড়িয়াছ। দু'পয়সা বিলক্ষণ তোমার আমদানি হইতেছে। ভূস্বামীকে ট্যাক্স দিতে হইবে।"

সাধু উত্তর করিলেন,—"আমরা উদাসীন। আমি নিজে বায়ু ভক্ষণ করি। চেলারা এখনও যৎকিঞ্চিৎ আহার করে। দীন-দুঃখীকে আমরা কিছু দান করি। কোন পরিব্রাজক আসিলে তাহার সেবায় কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করি। সেজন্য পুণ্যাত্মা ভক্তগণ যাহা প্রদান করে, আমার শিষ্যদ্বয় এ স্থানে খরচের জন্য তাহার অর্ধেক রাখিয়া, অবশিষ্ট ধন প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তোমাকে দিয়া আসিবে।"

বলা বাহুল্য যে, আহ্লাদসহকারে আমি এ প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। কোনদিন চারি টাকা কোনদিন পাঁচ টাকা আমার লাভ হইতে লাগিল। সন্ন্যাসীর প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি হইল। যাহাতে তাহার প্রসার-প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি হয়, দেশের মত উজবুক যাহাতে তাহার গোঁড়া হয়, সেজন্য আমি চেষ্টা করিতে লাগিলাম। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম যে দুগ্ধবতী গাভীর ন্যায় সন্ন্যাসীটিকে আমি পুষিয়া রাখিব। কিন্তু একটা হুজুগ লইয়া বাঙালী অধিক দিন থাকিতে পারে না। হুজুগ একটু পুরাতন হইলেই বাঙালী পুনরায় নূতন হুজুগের সৃষ্টি করে। অথবা এই বঙ্গভূমির মাটীর গুণে আপনা হইতেই নূতন হুজুগের উৎপত্তি হয়। এই সময় এ স্থান হইতে চারি ক্রোশ দূরে পাঁচগেছে রসিক মণ্ডলের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যার স্কন্ধে মাকালঠাকুর অধিষ্ঠান হইলেন। রসিক মণ্ডল জাতিতে পোদ। মাকালঠাকুরের ভরে সেই কন্যা লোককে ঔষধ দিতে লাগিল। দেবদত্ত ঔষধের গুণে অন্ধের চক্ষু, বধিরের কর্ণ, পঙ্গুর পা হইতে লাগিল। বোবার কথা ফুটিতে লাগিল। কতকগুলি সুস্থ লোককে কানা খোঁড়া, হাবা কালা, জোরো অঙ্গুলে সাজাইতে হয়, তা না করিলে এ কাজে পসার হয় না। তুলসীর মালা গলায় দিয়া সেই ইংরাজী কাগজের লেখকও সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। ভক্তিতে গদগদ হইয়া কত কি তাহাদের কাগজে লিখিয়া বসিল। বি-এ, এম-এ পাস করা ছোঁড়ারা আবার সন্ন্যাসীকে ছাড়িয়া সেই পোদ ছুঁড়ীর পাদক-জল খাইতে গেল। কাতারে কাতারে সেই গ্রামে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। রসিক মণ্ডলের ঘরে টাকা-পয়সা আর ধরে না। আমার সন্ন্যাসীর আস্তানা ভোঁ ভোঁ হইয়া গেল। রসিক মণ্ডলের মত আমার কেন বুদ্ধি যোগায় নাই, আমি কেন সেইরূপ ফন্দি করি নাই, আমি কেন একটা ছোট ছুঁড়ীকে বাহির করি নাই, সেই আপশোসে আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

এইরূপ দুঃখে আছি, এমন সময় একজন চেলা সন্ন্যাসীর হাত ধরিয়া আমার বাড়ীতে আনিয়া উপস্থিত করিল। সন্ন্যাসী বলিল যে, নিভৃতে তোমার সহিত কোন কথা আছে। আমি, সন্ন্যাসী ও তাহার চেলা এক ঘরে যাইলাম। সন্ন্যাসী বলিল যে, ট্যাক্স বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সে জন্য নিশ্চয় তোমার মনে সন্দ হইয়াছে, কিন্তু দুঃখ করিও না, অন্য উপায়ে তোমাকে আমি বিপুল ধনের অধিকারী করিব। একটি টাকা দাও দেখি?

সন্ন্যাসীর হাতে আমি একটি টাকা দিলাম। সেই টাকাটিকে তৎক্ষণাৎ

দ্বিগুণ করিয়া দুইটি টাকা সন্ন্যাসী আমার হাতে দিল। তাহার পর সন্ন্যাসীর আদেশে ভিতর হইতে একটি মোহর আনিয়া দিলাম, তাহাও ডবল করিয়া দুইটি মোহর সন্ন্যাসী আমার হাতে দিল। শেষে একখানি দশ টাকার নোটও ডবল করিয়া আমার হাতে দিল।

তাহার পর সন্ন্যাসী আমাকে বলিল,—"এ কাজ অধিক পরিমাণে করিতে পূজা-পাঠের আবশ্যক। তোমার ঘরে যত টাকা, মোহর, নোট, সোনা-রুপা আছে, পূজা-পাঠ করিয়া সমুদয় আমি ডবল করিয়া দিব।"

আমি উত্তর করিলাম,—"সন্ন্যাসীঠাকুর। আমি নিতান্ত বোকা নই। এরূপ বুজরুকির কথা আমি অনেক শুনিয়াছি। গৃহস্থের বাড়ী গিয়া দুই-একটি টাকা অথবা নোট ডবল করিয়া তোমরা গৃহস্বামীর বিশ্বাস উৎপাদন কর। তোমাদের কুহকে পড়িয়া গৃহস্বামী ঘরের সমুদয় টাকা-কড়ি গহনা-পত্র আনিয়া দেয়। হাঁড়ী অথবা বাক্সের ভিতর সেগুলি বন্ধ করিয়া তোমরা পূজা কর। পূজা সমাপ্ত করিয়া সাত দিন কি আট দিন পরে গৃহস্বামীকে খুলিয়া দেখিতে বল। সেই অবসরে তোমরা চম্পট দাও। সাত আট দিন পরে গৃহস্বামী খুলিয়া দেখে যে হাঁড়ী ঢন ঢন। বাজিকরের ও চালাকি আমার কাছে খাটিবে না।"

সন্ন্যাসী বলিল,—"পূজা-পাঠ করিয়া আমি চলিয়া যাইব না। তোমার ঘরে তুমি আমাকে বন্ধ করিয়া রাখিও। আর দেখ আমি অন্ধ। কাহারও সহায়তা ভিন্ন দুই পা চলিতে পারি না। পলাইব কি করিয়া? পূজার দিন কোন শিষ্যকে আমি এ স্থানে আসিতে দিব না। সাত আট দিন পরে তোমাকে টাকা-কড়ি খুলিয়া দেখিতে বলিব না; পূজা সমাপ্ত হইলেই তৎক্ষণাৎ তুমি খুলিয়া দেখিবে যে, সমুদয় সম্পত্তি দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে।"

সন্ন্যাসীর এরূপ প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম। সন্ন্যাসী শুভদিন ও শুভলগ্ন স্থির করিল। পূজা ও হোমের উপকরণের ফর্দ দিল। সে সমুদয় আমি সংগ্রহ করিলাম। বাড়ীর দোতলায় নিভৃত একটি ঘরে পূজার আয়োজন করিলাম। ঘরে টাকা, মোহর, নোট যত ছিল ও বিবাহের নিমিত্ত যে গহনা গড়াইয়াছিলাম, সে সমুদয় বৃহৎ একটি বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া পূজার স্থানে লইয়া যাইলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চিত্রগুপ্তের গলায় দড়ি—মোটা দড়ি নয়

নির্ধারিত দিন সন্ধ্যার সময় কেবল সন্ন্যাসী ও আমি সেই ঘরে গিয়া উপবেশন করিলাম। সন্ন্যাসী পাছে কোনরূপে পলায়ন করে, সেজন্য ঘরের দ্বারে চাকরকে কুলুপ দিয়া বন্ধ করিতে বলিলাম এবং একটু দূরে তাহাকে সতর্কভাবে পাহারা দিতে আদেশ করিলাম। সন্ন্যাসী ঘট স্থাপন করিল। দধি, পিঠালি ও সিন্দুর দিয়া ঘটে কি সব অঙ্কন করিল। তাহার পর ফট্ বষট্ শ্রীং ঐং এইরূপ কত কি মন্ত্র উচ্চারণ করিল। অবশেষে হোম করিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরে স্বাহা বলিয়া আগুনে ঘৃত দিয়া সন্ন্যাসী আপনার থলি হাতড়াইয়া একটি টিনের কৌটা বাহির করিল। সেই কৌটাতে এক প্রকার সবুজ রঙের গুঁড়া ছিল। হরিৎ বর্ণের সেই চূর্ণ সন্ন্যাসী আগুনে ফেলিয়া দিল।

ঘর সবুজ বর্ণের ধূমে পরিপূর্ণ হইল। আমার নিদ্রার আবেশ হইল। আমি ভাবিলাম যে, এইবার সন্ন্যাসী বেটা একটা কাণ্ড করিবে, আমাকে অজ্ঞান করিয়া আমার টাকাকড়ি লইয়া কোনরূপে পলায়ন করিবে। উঠিয়া, দ্বারে ধাক্কা মারিয়া আমার চাকরকে ডাকিব এইরূপ মানস করিলাম। আমি উঠিতে পারিলাম না। আমার হাত-পা অবশ অসাড় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমার জ্ঞান ছিল। হঠাৎ আমার মাথা হইতে "আমি" বাহির হইয়া পড়িলাম। আমার শরীরটি তৎক্ষণাৎ মাটির উপর শুইয়া পড়িল। শরীর হইতে যে, "আমি" বাহির হইয়াছি, তাহার দিকে তখন চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে সে "আমি" অতি ক্ষুদ্র, ঠিক বড়ো আঙুলের মত, আর সে শরীর বায়ু দিয়া গঠিত। সেই ক্ষুদ্রশরীরে আমি উপর দিকে উঠিতে লাগিলাম। সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীরের কথা পূর্বে শুনিয়াছিলাম। মনে করিলাম যে, ঔষধের ধূমে সন্ন্যাসী আমাকে হত্যা করিয়াছে, মৃত্যুর পর লোকের যে লিঙ্গশরীর থাকে, তাহাই এখন যমের বাড়ী যাইতেছে।

ছাদ ফুঁড়িয়া আমি উপরে উঠিয়া পড়িলাম। সোঁ সোঁ করিয়া আকাশ-পথে চলিলাম। দূর-দূর-দূর কতদূর উপরে উঠিয়া পড়িলাম, তাহা বলিতে পারি না। মেঘ পার হইয়া যাইলাম, চন্দ্রলোক পার হইয়া যাইলাম, সূর্য্যলোকে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে আশ্চর্য ঘটনা দর্শন করিলাম। দেখিলাম

যে, আকাশ-বুড়ী এক কদমগাছতলায় বসিয়া, আঁশবঁটি দিয়া সূর্য্যটিকে কুটি কুটি করিয়া কাটিতেছে, আর ছোট ছোট সেই সূর্য্যখণ্ডগুলি আকাশ-পটে জুড়িয়া দিতেছে। তখন আমি ভাবিলাম,—"ওঃ! নক্ষত্র এই প্রকারে হয় বটে! তবে এই যে নক্ষত্র সব, ইহারা সূর্য্যখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে! যে খণ্ডগুলি বুড়ী আকাশ-পটে ভাল করিয়া জুড়িয়া দিতে পারে না, আলগা হইয়া সেইগুলি খসিয়া পড়ে। তখন লোকে বলে,—'নক্ষত্র পাত হইল।' কিছুক্ষণ পরে আমার ভয় হইল যে,—সূর্য্যটি তো গেল, পৃথিবীতে পুনরায় দিন হইবে কি করিয়া? আকাশ-বুড়ী আমার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া বলিল,—"ভোরে ভোরে উঠিয়া আকাশে ঝাড়ু দিয়া সমুদয় নক্ষত্রগুলি আমি একত্র করিব। সেইগুলি জুড়িয়া পুনরায় আস্ত সূর্য্য করিয়া প্রাতঃকালে উদয় হইতে পাঠাইব। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা আঁশবটি দিয়া সূর্য্য কাটিয়া নক্ষত্র করি, সকালবেলা আবার সেইগুলি জুড়িয়া আস্ত সূর্য্য প্রস্তুত করি। আমার এই কাজ।"

আকাশ-বুড়ীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া, আমি ভাবিলাম যে, নভোমণ্ডলের সমুদয় ব্যাপারটা ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। এইরূপ ভাবিয়া পুনরায় আমি শূন্যপথে সোঁ সোঁ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু সর্বনাশ! কিছুদূর গিয়া দেখি যে, দুইটা বিকটাকার যমদূত আমার মত আর একটা সূক্ষ্ম শরীরকে লইয়া যাইতেছে। আমার বড় ভয় হইল। সে স্থানে মেঘ নাই যে, তাহার ভিতর লুকাইব। পলাইবার সময় পাইলাম না। খপ করিয়া তাহারা আমাকে ধরিয়া ফেলিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল,—'তুই বেটা কে রে? সত্য যুগের রাজা হরিশ্চন্দ্র ভিন্ন বে-ওয়ারিশ হইয়া আর কাহারও এখানে বেড়াইবার হুকুম নাই। নিশ্চয় তুমি বেটা কুম্ভিপাক অথবা রৌরব নরকের ফেরারি আসামী।' এই বলিয়া তাহারা আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল ও ধাক্কা মারিতে মারিতে লইয়া চলিল।

ক্রমে আমরা যমপুরীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যম দরবার করিয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন। পাশে স্তূপাকার খাতাপত্রের সহিত চিত্রগুপ্ত; সম্মুখে ডাঙ্গস হাতে ভীষণমূর্তি যমদূতের পাল। আমাদের দুইজনকে যমদূতেরা সেই রাজসভায় হাজির করিল। প্রথমে অপর লোকটির বিচার আরম্ভ হইল।

চিত্রগুপ্ত তাহাকে জিজ্ঞাস্য করিলেন,—"তোমার নাম?"

সে উত্তর করিল,—"আমার নাম বৃন্দাবন গুঁই।"

তাহার পর কোথায় নিবাস, কি জাতি প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া খাতা-পত্র

দেখিয়া যমকে চিত্রগুপ্ত বলিলেন,—"মহাশয়! এ লোকটি অতি ধার্মিক, অতি পুণ্যবান্। পৃথিবীতে বসিয়া এ বার মাসে তের পার্বণ করিত, দীন-দুঃখীর প্রতি সর্বদা দয়া করিত, সত্য ও পরোপকার ইহার ব্রত ছিল।"

এই কথা শুনিয়া যম চটিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন,—"চিত্রগুপ্ত! তোমাকে আমি বারবার বলিয়াছি যে, পৃথিবীতে গিয়া মানুষ কি কাজ করিয়াছে, কি কাজ না-করিয়াছে, তাহার আমি বিচার করি না। মানুষ কি খাইয়াছে, কি না-খাইয়াছে, তাহার আমি বিচার করি। ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা, স্ত্রী-হত্যা করিলে এখন মানুষের পাপ হয় না, অশাস্ত্রীয় খাদ্য খাইলে মানুষের পাপ হয়। তবে শিবোক্ত তন্ত্রশাস্ত্র মতে সংশোধন করিয়া খাইলে পাপ হয় না। তন্ত্রশাস্ত্রে শিব বলিয়াছেন,—

'গো-মেষাশ্ব-মহিষক-গোধাজোষ্ট্র-মৃগোদ্ভবম্।
মহামাংসাষ্টকং প্রোক্তং দেবতাপ্রীতিকারকম্॥'

গোমাংস, মেষমাংস, অশ্বমাংস, মহিষমাংস, গোধামাংস, ছাগমাংস, উষ্ট্রমাংস ও মৃগমাংস—এই অষ্টবিধ মাংসকে মহামাংস বলে। এই সকল মাংসই দেবতাদিগের তৃপ্তিদায়ক। 'ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুস্তরতে' অথবা 'ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু' এই মন্ত্রে সংশোধন করিয়া লইলে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও এই সমুদয় মাংস ভক্ষণ করিতে পারে। মৃগমাংসের ভিতর শূকরের মাংসও ধরিয়া লইতে হইবে। তন্ত্রশাস্ত্রে তাকে কলামাংস বলে, শিব তাহা খাইতেও সুমতি দিয়াছেন আর দেখ, চিত্রগুপ্ত! তুমি এ কেরাণীগিরি ছাড়িয়া দাও। পৃথিবীতে তোমার বংশধর কায়স্থগণ কি করিতেছে, একবার চাহিয়া দেখ। উড়ে গয়লার মত এক এক গাছা সূতা অনেকে গলায় পরিতেছে। ব্রাহ্মণকে তাহারা আর প্রণাম করে না। ইংরাজী পড়িয়া তাহাদের মেজাজ আগুন হইয়া গিয়াছে। তাই বলি যে, চিত্রগুপ্ত! তুমিও ইংরাজী পড়। ইংরাজী পড়িয়া তোমার হেডটি গরম কর। হেডটি গরম করিয়া তুমিও গলায় দড়ি দাও। মোটা দড়ি নয়। বুঝিয়াছ তো? গলায় দড়ি দিয়া 'চিত্রবর্মা' নাম গ্রহণ কর।"

এই কথা বলিয়া যম নিজে সেই লোকটিকে জেরা করিতে লাগিলেন,—"কেমন হে বাপু! কখনও বিলাতি বিস্কুট খাইয়াছিলে?"

সে উত্তর করিল,—"আজ্ঞে না।"

যম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিলাতি পানি? যাহা খুলিতে ফট্ করিয়া শব্দ হয়? যাহার জল বিজবিজ করে?"

সে উত্তর করিল,—"আজ্ঞে না।"

যম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সত্য করিয়া বল, কোনরূপ অশাস্ত্রীয় খাদ্য ভক্ষণ করিয়াছিলে কি না?"

সে ভাবিয়া-চিন্তিয়া উত্তর করিল,—"আজ্ঞা একবার ভ্রমক্রমে একাদশীর দিন পুঁইশাক খাইয়া ফেলিয়াছিলাম।"

যমের সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"সর্বনাশ! করিয়াছ কি! একাদশীর দিন পুঁইশাক! ওরে! এই মুহূর্তে ইহাকে রৌরব নরকে নিক্ষেপ কর। ইহার পূর্বপুরুষ, যাহারা স্বর্গে আছে, তাহাদিগকেও সেই নরকে নিক্ষেপ কর। পরে ইহার বংশধরগণের চৌদ্দপুরুষ পর্যন্তও সেই নরকে যাইবে। চিত্রগুপ্ত! আমার এই আদেশ তোমার খাতায় লিখিয়া রাখ।"

যমের এই বিচার দেখিয়া আমি তো অবাক। এইবার আমার বিচার। কিন্তু আমার বিচার আরম্ভ হইতে না হইতে আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম,—"মহারাজ! আমি কখন একাদশীর দিন পুঁইশাক ভক্ষণ করি নাই।"

আমার কথায় যম চমৎকৃত হইলেন। হর্ষোৎফুল্ল লোচনে তিনি বলিলেন,—"সাধু সাধু! এই লোকটি একাদশীর দিন পুঁইশাক খায় নাই। সাধু সাধু! এই মহাত্মার শুভাগমনে আমার যমালয় পবিত্র হইল। যমনীকে শীঘ্র শঙ্খ বাজাইতে বল। যমকন্যাদিগকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে বল। বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া আন—, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যলোক পারে ধ্রুবলোকের উপরে এই মহাত্মার জন্য মন্দাকিনী-কলকলিত, পারিজাত-পরিশোভিত কোকিল-কুহরিত, অপ্সরাপদ-নূপুর-ঝুনঝুনিত হীরা-মাণিক-খচিত নূতন একটি স্বর্গ নির্মাণ করিতে বল।"

চিত্রগুপ্তের—ওঁ খুড়ি! চিত্রবর্মার হিংসা হইল। তিনি বলিলেন,—"মহাশয়! পৃথিবীতে লোকটির এখনও আয়ু শেষ হয় নাই। স্থূল দেহের রক্তমাংসের আঁসটে গন্ধ এখনও ইহার সূক্ষ্ম শরীরে রহিয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া যম চটিয়া আগুন হইলেন। আমার আদর লোপ হইল। তিনি বলিলেন—"কি! সাদা সাদা গোল গোল হাঁসের ডিমের গন্ধ গায়ে! মার্, ইহার মাথায় দশ ঘা ডাঙ্গস মার্।"

যম বলিবামাত্র তাঁহার একজন দূত আমার মাথায় এক ঘা ডাঙ্গস মারিল। বলিব কি হে, মাথায় আমার যেন ঠিক বজ্রাঘাত হইল। যাতনায় ত্রাহি মধুসূদন বলিয়া আমি চীৎকার করিতে লাগিলাম। সেই এক ঘা ডাঙ্গসে যমপুরী হইতে আকাশপথে অনেক নিম্নে আসিয়া পড়িলাম। দমাস করিয়া

আর এক ডাঙ্গসের ঘা! শূন্যপথে আরও নীচে আসিয়া পড়িলাম। আর এক ঘা! আরও নিম্নে আসিয়া পড়িলাম। এইরূপ দশম আঘাতে পৃথিবীতে আসিয়া আমার বাড়ীর ছাদ ফুঁড়িয়া আমার সূক্ষ্ম শরীর পুনরায় সেই পূজার ঘরে আসিয়া পড়িল।

নিজের বাড়ীতে সেই পূজোর ঘরে আসিয়া ক্ষুদ্র মাথায় ক্ষুদ্র হাত বুলাইতে লাগিলাম। প্রহারের চোটে চক্ষুতে সরিষা-ফুল দেখিতেছিলাম। অনেকক্ষণ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। অনেকক্ষণ পরে চাহিয়া দেখি যে, "আমি" বসিয়া আছি। অর্থাৎ আমার সেই বড় শরীর আসনে বসিয়া আছে, আর সন্ন্যাসীর শরীর মাটিতে পড়িয়া আছে। কি হইয়াছে, তখন বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম, যে সবুজ গুঁড়ার ধূম দিয়া আমার শরীর হইতে প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, আর সকল কোষ বাহির করিয়া, সন্ন্যাসী আপনার সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা আমার স্থূল অন্নময় কোষ অধিকার করিয়াছে। আমার শরীর বটে, কিন্তু ঐ যে আসনে বসিয়া আছে, ও আমি নই, ও সন্ন্যাসী। সূক্ষ্ম শরীরে মুখ দিয়া আমি সন্ন্যাসীর সহিত কথোপকথন করিতে পারিলাম না! সেজন্য নিরুপায় হইয়া আমি সন্ন্যাসীর দেহে প্রবেশ করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ডমরুধরের তপস্যা

সন্ন্যাসীর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া আমি উঠিয়া বসিলাম। তাহার পর ক্রোধে আমি সন্ন্যাসীকে বলিলাম,—"ভণ্ড! আমার শরীর ছাড়িয়া নিজের শরীরে পুনরায় প্রবেশ কর।"

সন্ন্যাসী উত্তর করিল,—"এ পৃথিবীতে অন্ধ হইয়া দুঃখে কালযাপন করিতেছিলাম। ভোগবাসনা এখনও আমার পরিতৃপ্ত হয় নাই। মানস করিয়াছিলাম যে, কোন যুবা ধনবান লোকের শরীরে আশ্রয় করিব। সেরূপ লোকের যোগাড় করিতে পারি নাই। কাজেই তোমার জীর্ণ শরীরে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। তোমার এই শরীর দ্বারা এখন সুখাদ্য ভক্ষণ করিব, নানারূপ আমোদ-প্রমোদ করিব। তোমার বিবাহসম্বন্ধ হইয়াছে। তোমার শরীরে আমি বিবাহ করিব, তোমার গৃহিণীকে লইয়া ঘরকন্না করিব। মিছামিছি তুমি গোল করিও না। লোকের নিজের যেরূপ অভ্যাস হয় অর্থাৎ

শরীরকে আত্মা বলিয়া মনে হয়, অন্য লোকেরও সেইরূপ হয়। তোমার শরীর দেখিয়া সকলে বলিবে যে, এই ডমরুধর ; আমার শরীর দেখিয়া সকলে বলিবে যে, এই সন্ন্যাসী। কেহই বিশ্বাস করিবে না যে, আমার আত্মা তোমার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে। শঙ্করাচার্য ও হস্তামলকের গল্প শুনিয়া থাকিবে। আজ তাই হইয়াছে! বেশীর ভাগ কেবল একটু "হের-ফের।"

ক্রোধে অধীর হইয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে আমি সন্ন্যাসীর গলা টিপিয়া ধরিলাম। কিন্তু তখন আমি পাঁচ শত তিপান্ন বৎসরের পুরাতন সন্ন্যাসীর শরীরে ছিলাম। তাহার উপর আবার দুই চক্ষু অন্ধ। সন্ন্যাসীর আমি কিছুই করিতে পারিলাম না। হাসিয়া সে দূরে আমাকে ফেলিয়া দিল।

আমার দেহধারী সন্ন্যাসী পুনরায় বলিল,—"যদি গোলমাল কর, তাহা হইলে তোমার ঘোরতর অনিষ্ট হইবে। তোমার চাকরের দ্বারাই তোমাকে আমি এই বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিব। অন্ধ ও বৃদ্ধ শরীর লইয়া তখন তুমি কি করিয়া দিন যাপন করিবে? আমার শিষ্যদ্বয় এ ব্যাপারে অবগত আছে, তাহাদিগকে ডাকিতে পাঠাইয়াছি। তাহাদের সহিত আস্তে আস্তে আমার আস্তানায় গমন কর। প্রাতঃকালে এক ঘণ্টাকাল তাহারা তোমাকে নীচের দিকে মুখ করিয়া ঝুলাইবে। সমস্ত দিন তুমি বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। ঘোর রাত্রিতে চুপি চুপি আহার করিবে। যতদিন তোমার ঐ বর্তমান শরীর জীবিত থাকে, তত দিন তোমাকে আমি খাইতে দিব।"

আর উপায় কি? আমি নীরব হইয়া বসিয়া রহিলাম। সন্ন্যাসীর দুই জন চেলা আসিয়া আমার দুই হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। অন্ধ দুইটি চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল। বিন্দী গোয়ালিনীর চালা ঘরে আমাকে লইয়া গেল। সে রাত্রি মাটির উপর পড়িয়া কাঁদিয়া কাটাইলাম। পরদিন প্রত্যূষে চেলা দুই জন আমার দুই পায়ে দড়ি বাঁধিয়া আমগাছের ডালে ঝুলাইয়া দিল। এক ঘণ্টাকাল অধোমুখে আমি ঝুলিতে লাগিলাম। সে যে কি যাতনা, তাহা আর তোমাদিগকে কি বলিব। অন্ধ, তা না হইলে চক্ষু দুইটি ঘোর রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইত। সন্ন্যাসীর গায়ের বর্ণও কাল ছিল, তা না হইলে মুখ লাল হইয়া যাইত। ঘোর কষ্ট! ঘোর কষ্ট! কেন যে দম আটকাইয়া মরিয়া যাই নাই, তাহাই আশ্চর্য।

লম্বোদর প্রভৃতি একবাক্যে বলিয়া উঠিল—"ঈশ! তুমি ত সামান্য বিপদে পড় নাই।"

ডমরুধর বলিলেন,—"হাঁ! আমি ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলাম। কেবল মা দুর্গার কৃপায় আমি সে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম।"

ডমরুধর বলিতে লাগিলেন,—"এক ঘণ্টা পরে তাহারা আমাকে গাছ হইতে নামাইয়া লইল। তাহার পর সমস্ত দিন তাহারা আমাকে জলটুকু পর্য্যন্ত খাইতে দিল না। তাহারা কিন্তু একে একে আমার বাড়ীতে গিয়া আহার করিয়া আসিল। আসিয়া বলিল যে—ডমরু বাবুর বাড়ীতে আজ খুব ঘটা। পাঁচ ছয়টা খাসি কাটা হইয়াছে। নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রামসুদ্ধকে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে তাঁহার বিবাহ পর্যন্ত প্রতিদিন মহাসমারোহের সহিত সকলকে ভোজন করাইবেন।"

লম্বোদর বলিলেন,—"হাঁ! সেই সময় দিনকত তোমার বাড়ীতে খুব ধুম হইয়াছিল। প্রতিদিন ষোড়শ উপাচারে তোমার বাড়ীতে আমরা ভোজন করিয়াছিলাম! তখন তোমার সেই শরীরটিকে 'তুমি' বলিয়াই আমরা মনে করিয়াছিলাম। সহসা তোমার মতিগতির কিরূপে পরিবর্তন হইল, তাহা ভাবিয়া সকলে আমরা আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম। তোমার কেনারাম চাকর ও চেলা দুই জন বলিল যে, সন্ন্যাসী ঠাকুর তোমার সমুদয় সম্পত্তি ডবল করিয়া দিয়াছেন, সেই আহ্লাদে তুমি মুক্তহস্ত হইয়াছ। কেহ কেহ বলিল যে, নূতন বিবাহের আমোদে আটখানা হইয়া তুমি এত টাকা খরচ করিতেছ। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, সে তুমি নও, তোমার শরীরে অধিষ্ঠিত সন্ন্যাসী।"

ডমরুধর বলিলেন,—"আমি বৃথা টাকা খরচ করিব? আমি সে পাত্র নই। "আমি" সাজিয়া সন্ন্যাসী বেটা আমার সম্পত্তি নষ্ট করিতেছে, তাহা ভাবিয়া বুক আমার ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ঘোর রাত্রিতে একজন চেলা আমার জন্য খাবার লইয়া আসিল। পোলাও, কালিয়া, কুর্মা, কোপ্তা, কাটলেট, সন্দেশ, রসগোল্লা, খাজা, গজা, বেদানা, আঙ্গুর, প্রভৃতি সামগ্রী। ঈষৎ হাসিয়া চেলা বলিল,—"আপনার প্রতি ডমরু বাবুর বড় ভক্তি! উঠুন, আহার করুন।" কিন্তু ছাই আমি আর খাইব কি! আমার সর্বনাশ করিয়া সেই সমুদয় সুখাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাই ভাবিয়া আমার প্রাণ আকুল হইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় আমাকে তাহারা গাছে ঝুলাইয়া দিল। তাহার পর সমস্ত দিন অনশনে রাখিয়া গভীর রাত্রিতে আমাকে খাবার দিল। প্রতিদিন এই ভাবে চলিতে লাগিল। ওদিকে আমার নিজ বাটীতে

ধূমধামের সীমাপরিসীমা নাই। প্রতি দিন যজ্ঞ। দিনের বেলা সাধারণ লোকের ভোজন, রাত্রিতে বন্ধু-বান্ধবের সহিত কিছু উচ্চ রকমের স্ফূর্তি করিতেছিল। সেরি শ্যাম্পেন প্রভৃতি বহুমূল্য মদ চলিতেছিল। কেবল আমার টাকার শ্রাদ্ধ!

ক্রমে শ্রাবণ মাস আসিল। আমার বিবাহের জন্য যে শুভদিন স্থির হইয়াছিল, সেই দিন নিকটবর্তী হইল। যে শরীরে আমি অবস্থান করিতেছিলাম, তাহা অন্ধ বটে, কিন্তু কান তো অন্ধ ছিল না; কয়দিন আগে থাকিতে রোশনচৌকির বাজনা আমার কানে প্রবেশ করিতেছিল। তাহার পর বিবাহের পূর্ব দিনে ইংরাজি বাজনা, দেশী বাজনা, ঢাক ঢোল সানাইয়ের রোলে ও লোকের কোলাহলে আমার কান ছেঁদা হইয়া গেল। শুনিলাম যে "ডমরুবাবু" মহাসমারোহের সহিত বিবাহ করিতে যাইবেন।

পাছে কোন যমদূতের সহিত সাক্ষাৎ হয়, পাছে বেওয়ারিস আসামী বলিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া যায়, পাছে পুনরায় আমার মাথায় ডাঙ্গস মারে, সেই ভয়ে এত দিন সন্ন্যাসীর শরীর হইতে আমার সূক্ষ্ম শরীর বাহির করিতে চেষ্টা করি নাই। কিন্তু একে আমার টাকার শ্রাদ্ধ, তাহার উপর সন্ন্যাসী আমার শরীরে আমার জন্য মনোনীত কন্যাকে গিয়া বিবাহ করিবে, এই দুঃখ মনের ভিতর আমার দাবানল জ্বলিতে লাগিল। সে দিন চেলা দুই জন যখন গাছ হইতে আমাকে নামাইয়া চলিয়া গেল, তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসীর শরীর হইতে বাহির হইবার নিমিত্ত বার বার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অবশেষে কৃতকার্য হইলাম, সন্ন্যাসীর শরীর অন্ধ, কিন্তু আমার লিঙ্গ শরীর অন্ধ নহে। অনেক দিন পরে পৃথিবীর বস্তুসমূহ দেখিয়া মনে আমার আনন্দ হইল। সন্ন্যাসীর দেহ বিন্দীর চালা ঘরে ফেলিয়া সূক্ষ্ম শরীরে আমি আমার নিজের বাটীতে গমন করিলাম। সে স্থানের ঘোর ঘটা দেখিয়া বুক আমার ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বাড়ীটি সুসজ্জিত হইয়াছে, কোন স্থানে বাজনাওয়ালারা বসিয়া আছে, কোন স্থানে রোশনাইয়ের বন্দোবস্ত হইতেছে, বরযাত্রীদিগের নিমিত্ত কলিকাতা হইতে অনেকগুলি ফাষ্টোকেলাস গাড়ি আসিয়াছে। বরের জন্য চারি ঘোড়ার গাড়ি আসিয়াছে। আমাদের গ্রাম হইতে কন্যার গ্রাম সাত ক্রোশ। পথ ভাল নহে—মেটে রাস্তা, কিন্তু শুনিলাম যে, অনেক টাকা খরচ করিয়া "ডমরু বাবু" সে রাস্তা মেরামত করিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছাল-ছাড়ান বাঘ

এইরূপে চারিদিকে আমি দেখিয়া বেড়াইলাম। বলা বাহুল্য যে, আমাকে কেহ দেখিতে পাইল না। সূক্ষ্মশরীর অতি ক্ষুদ্র, হাওয়া দিয়া গঠিত, সূক্ষ্মশরীর কেহ দেখিতে পায় না। একে যমদূতের ভয়, তাহার উপর আবার এই সমুদয় হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! সে স্থানে আমি অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিলাম না। আমি ভাবিলাম,—"দূর কর! বনে গিয়া বসিয়া থাকি। সুন্দরবনে মনুষ্যের অধিক বাস নাই, যমদূতদিগের সে দিকে বড় যাতায়াত নাই, সেই সুন্দরবনে গিয়া বসিয়া থাকি।"

বায়ুবেগে সুন্দরবনের দিকে চলিলাম। প্রথম আমি আমার আবাদে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে আমার কোন কর্মচারীকে দেখিতে পাইলাম না। কেহ মাছ, কেহ ঘৃত, কেহ মধু, কেহ পাঁঠা লইয়া তাহারা "আমার" বিবাহে নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। সে স্থান হইতে আমি গভীর বনে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম যে, এক গাঙের ধারে একখানি নৌকা লাগিয়া আছে, উপরে পাঁচ ছয়জন কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতেছে। তাহাদের সঙ্গে মুগুর হাতে একজন ফকীর আছে। মন্ত্র পড়িয়া ফকীর বাঘদিগের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। নির্ভয়ে কাঠুরিয়াগণ কাঠ কাটিতেছে। সেই স্থানে গিয়া আমি একটি শুষ্ক কাঠের উপর উপবেশন করিলাম। বলা বাহুল্য যে, তাহারা আমাকে দেখিতে পাইল না।

এই স্থানে বসিয়া মনের বেদনায় আমি কাঁদিতে লাগিলাম। অশ্রুজলে আমার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। না এদিক, না ওদিক, না মরা, না বাঁচা, আমার অবস্থা ভাবিয়া আমি আকুল হইলাম। আজ "আমি" সাজিয়া সন্ন্যাসী আমার কন্যাকে বিবাহ করিবে, বাসর-ঘরে সন্ন্যাসী গান করিবে, তাহার পর ফুলশয্যা হইবে,—ওঃ! আর আমার প্রাণে সয় না। হায় হায়! আমার সব গেল। হঠাৎ এই সময় মা দুর্গাকে আমার স্মরণ হইল। প্রাণ ভরিয়া মাকে আমি ডাকিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—"মা! তুমি জগতের মা! তোমার এই অভাগা পুত্রের প্রতি কৃপা কর। মহিষাসুরের হাত হইতে দেবতাদিগকে তুমি পরিত্রাণ করিয়াছিলে, সন্ন্যাসীর হাত হইতে তুমি আমাকে নিস্তার কর। মনসা লক্ষ্মীর কখন পূজা করি নাই, ঘেঁটু পূজাও করি নাই, কোন দেবতার পূজা করি নাই। কিন্তু এখন হইতে, মা

প্রতি বৎসর তোমার পূজা করিব। অকালে তোমার পূজা করিয়া রামচন্দ্র বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছিলেন। আমিও মা! সেইরূপ অকালে তোমার পূজা করিব। তুমি আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার কর।" ব্রজের নন্দ ঘোষের স্বজাতি কলিকাতার হরিভক্ত গোয়ালা মহাপ্রভুরা কসাইকে যখন নবপ্রসূত গোবৎস বিক্রয় করেন, কসাই যখন শিশু বৎসের গলায় দড়ি দিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া যায়, তখন সেই দুধের বাছুরটি নিদারুণ কাতরকণ্ঠে যেরূপ মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে, সেইরূপ কাতর স্বরে আমিও মা দুর্গাকে ডাকিতে লাগিলাম।

জগদম্বার মহিমা কে জানে! প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিলে তিনি কৃপা করেন। জগদম্বা আমায় কৃপা করিলেন। বন হইতে হঠাৎ এক বাঘ আসিয়া কাঠুরিয়াদিগের মাঝখানে পড়িল। সুন্দরবনের মানুষখেগো প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র! শরীরটি হরিদ্রাবর্ণের লোমে আচ্ছাদিত, তাহার উপর কাল কাল ডোরা। এ তোমার চিতে বাঘ নয়, গুল বাঘ নয়, এ বাবা, টাইগার! ইংরাজিতে যাহাকে রয়াল টাইগার বলে, এ সেই আসল রয়াল টাইগার!

এক চাপড়ে একজন কাঠুরিয়াকে বাঘ ভূতলশায়ী করিল, ফকীরের মন্ত্রে তাহার মুখ বন্ধ ছিল, মুখে করিয়া তাহাকে সে ধরিতে পারিল না। সেই স্থানে শুইয়া থাবা দিয়া মানুষটাকে পিঠে তুলিতে চেষ্টা করিল। না-মোটা না-সরু নিকটে একটা গাছ ছিল। বাঘের দীর্ঘ লাঙ্গুলটি সেই গাছের পাশে পড়িয়াছিল। একজন কাঠুরিয়ার একবার উপস্থিত বুদ্ধি দেখ! বাঘের লাঙ্গুলটি লইয়া সে সেই গাছে এক পাক দিয়া দিল, তাহার পর লেজের আগাটি সে টানিয়া ধরিল।

বাঘের ভয় হইল। বাঘ মনে করিল,—মানুষ ধরিয়া মানুষ খাইয়া বুড়া হইলাম, আমার লেজ লইয়া কখন কেহ টানাটানি করে নাই। আজ বাপধন! তোমাদের একি নূতন কাণ্ড! পলায়ন করিতে বাঘ চেষ্টা করিল। একবার, দুইবার, তিনবার বিষম বল প্রকাশ করিয়া বাঘ পলাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু গাছে লেজের পাক, বাঘ পলাইতে পারিল না। অসুরের মত বাঘ যেরূপ বল প্রকাশ করিতেছিল, তাহাতে আমার মনে হইল যে, যাঃ! লেজটি বা ছিঁড়িয়া যায়। কিন্তু দৈবের ঘটনা একবার দেখ! এত টানাটানিতেও বাঘের লাঙ্গুল ছিঁড়িয়া গেল না। তবে এক অসম্ভব ঘটনা ঘটিল। প্রাণের দায়ে ঘোরতর বলে বাঘ শেষকালে যেমন এক হ্যাঁচকা টান মারিল, আর

চামড়া হইতে তাহার আস্ত শরীরটা বাহির হইয়া পড়িল। অস্থি মাংসের দগদগে গোটা শরীর, কিন্তু উপরে চর্ম নাই! পাকা আম্রের নীচের দিকটা সবলে টিপিয়া ধরিলে যেরূপ আঁটিটা হড়াৎ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, বাঘের ছাল হইতে শরীরটি সেইরূপ বাহির হইয়া পড়িল, কলিকাতার হিন্দু কসাই মহাশয়েরা জীবন্ত পাঁঠার ছাল ছাড়াইলে চর্মবিহীন পাঁঠার শরীর যেরূপ হয়, বাঘের শরীরও সেইরূপ হইল। মাংসে বাঘ রুদ্ধশ্বাসে বনে পলায়ন করিল।

ফকীর ও কাঠুরিয়াগণ ঘোরতর বিস্মিত হইয়া এক দৃষ্টে হাঁ করিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। বাঘের লাঙ্গুল লইয়া গাছে যে পাক দিয়াছিল, লেজ ফেলিয়া দিয়া সেও সেই দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। বাঘশূন্য ব্যাঘ্রচর্ম সেই স্থানে পড়িয়া রহিল। আমার কি মতি হইল, গরম গরম সেই বাঘ-ছালের ভিতর আমি প্রবেশ করিলাম। ব্যাঘ্র চর্মের ভিতর আমার সূক্ষ্ম শরীর প্রবিষ্ট হইবা মাত্র ছালটা সজীব হইল। গা ঝাড়া দিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। গাছ হইতে লাঙ্গুলটি সরাইয়া লইলাম। পাছে ফের পাক দেয়! তাহার পর দুই একবার আস্ফালন করিলাম। পূর্বে তো অবাক হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা এখন দশগুণ অবাক হইয়া ফকীর ও কাঠুরিয়াগণ দৌড়িয়া নৌকায় গিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি নৌকা নদীর মাঝখানে লইয়া দ্রুতবেগে ভাটার স্রোতে তাহারা পলায়ন করিল।

এখন এই নূতন শরীরের প্রতি একবার আমি চাহিয়া দেখিলাম। এখন আমি সুন্দরবনের কেঁদোবাঘ হইয়াছি—সেই যারে বলে রয়াল টাইগার। ভাবিলাম যে,—এ মন্দ কথা নয়, এখন যাই, এই শরীরে বিবাহ-আসরে গিয়া উপস্থিত হই। এখন দেখি, সন্ন্যাসী বেটা কেমন করিয়া আমার কন্যাকে বিবাহ করে। এইরূপ স্থির করিয়া আমি দৌড়িলাম। কখন নিবিড় বনের ভিতর দিয়া চলিলাম, কখন লোকের আবাদের ধার দিয়া চলিলাম। সাঁতার দিয়া অথবা লম্ফ দিয়া শত শত নদী-নালা পার হইলাম। যে গ্রামে কন্যার বাড়ী, সন্ধ্যার সময় তাহার এক ক্রোশ দূরে গিয়া পৌঁছিলাম। দূর হইতে আলো দেখিয়া ও বাজনা-বাদ্যের শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম যে, ঐ বর আসিতেছে। সেই দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলাম। আলুম করিয়া এক লাফ দিয়া প্রথম বাদ্যকরদিগের ভিতর পড়িলাম, কালো কালো বিলাতী সাহেবরা কোট-পেণ্ট পিঁধে যাহারা বিলাতী বাজনা বাজাইতেছিল, তাহারা আমার সেই মেঘ-গর্জনের ন্যায় আলুম শব্দ শুনিয়া আর আমার সেই রুদ্রমূর্তি দেখিয়া আপন

আপন যন্ত্র ফেলিয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। ঢাকী ঢুলীদের ত কথাই নাই। তাহাদের কেহ পলাইল, কেহ কেহ সেই স্থানে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। যাহারা আলো প্রভৃতি লইয়া চলিয়াছিল, তাহারাও সকলে পলায়ন করিল। তাহার পর পুনরায় আলুম করিয়া আমি বরযাত্রদিগের গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম। টপ টপ করিয়া তাহারা গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল ও যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল।

লম্বোদর বলিলেন,—"আমিও বরযাত্র গিয়াছিলাম। আমি একটি গাছে গিয়া উঠিয়াছিলাম।"

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—"গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িতে আমার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। শেষে কেলেহাঁড়ী মাথায় দিয়া সমস্ত রাত্রি একটা পুষ্করিণীতে গা ডুবাইয়া বসিয়া রহিলাম।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ডমরুধরের গলায় কফ

ডমরুধর বলিলেন,—"তাহার পর লম্ফ দিয়া একেবারে আমি বরের চারি ঘোড়ার গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। ঘোর ত্রাসে সন্ন্যাসীর হৃৎকম্প হইল। আমার শরীর হইতে ফট করিয়া সে সূক্ষ্মশরীর বাহির করিল। আপনার সূক্ষ্মশরীর লইয়া কোথায় যে সে পলায়ন করিল, তাহা বলিতে পারি না। সেই দিন হইতে তাহাকে অথবা তাহার চেলা দুইজনকে আর কখন আমি দেখিতে পাই নাই।

আমি দেখিলাম যে, গাড়ীর উপর আমার দেহটি পড়িয়া রহিয়াছে। বাঘছাল হইতে বাহির হইয়া তৎক্ষণাৎ আমি নিজদেহে প্রবেশ করিলাম। গাড়ীর গদিতে বাঘছালখানি পাতিয়া তাহার উপর আমি গঠ হইয়া বসিলাম। নিজের শরীর পুনরায় পাইয়া আনন্দে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলাম। কন্যার জন্য যে সমুদয় গহনা প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সম্মুখে দেখিলাম যে সেই গহনার বাক্সটি রহিয়াছে। পরে শুনিলাম যে, ঘটকীর পরামর্শে সন্ন্যাসী এই গহনার বাক্স সঙ্গে আনিয়াছিল।

এখন বিবাহ-বাড়ীতে যাইতে হইবে। কিন্তু নিকটে জনপ্রাণী ছিল না।

একেলা বিবাহবাড়ীতে যাইতে পারি না। গাড়ী হইতে নামিলাম। পথ হইতে একটি ঢোল লইয়া নিজেই ঢ্যাং ঢ্যাং করিয়া বাজাইতে লাগিলাম। যে তিন চারি জন ঢাকী ঢুলী বাঘ দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, ক্রমে তাহাদের চেতনা হইল। পিট্ পিট্ করিয়া আমার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া তাহারা উঠিয়া বসিল। অন্য বাদ্যকর কেহ আসিল না। পরে শুনিলাম যে, তাহারা প্রাণপণে দৌড়িয়া একেবারে কলিকাতা গিয়া তবে নিশ্বাস ফেলিয়াছিল। ভালই হইয়াছিল। তাহাদিগকে টাকা দিতে হয় নাই। বিবাহের পর দিন, কন্যা লইয়া যখন নিজ গ্রামে আমি প্রত্যাগমন করি, তখন তাহাদের যন্ত্রগুলি আমি কুড়াইয়া আনিয়াছিলাম। কিছুদিন পরে যখন তাহারা আসিল, তখন অনেক কষ্টে আমার নিকট হইতে যন্ত্রগুলি বাহির করিল। টাকা আর চাহিবে কোন্ লজ্জায়?

আমার কেনারাম চাকর ও দুই চারিজন বরযাত্র ক্রমে আসিয়া জুটিল। প্রথম তাহারা মনে করিয়াছিল যে, নিকটে মানুষ আনিবার নিমিত্ত বাঘ স্বয়ং ঢোল বাজাইতেছে। যাহা হউক, সেই দুই চারি জন বরযাত্র ও দুই চারিজন বাদ্যকর লইয়া আমি বিবাহ-বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। অধিক কথায় প্রয়োজন কি? প্রথম তো কন্যা সম্প্রদান হইল। তাহার পর আমাকে সকলে ছাদনাতলায় লইয়া গেল। একপাল স্ত্রীলোক আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাড়কা রাক্ষসীর মত এক মাগী প্রথম আমার এক কান মলিয়া দিল আর বলিল,—"বিবাহ তৃতীয় পক্ষে, সে কেবল পিত্তি রক্ষে।" এইরূপে একবার সে কান মলিতে লাগিল এবং ঐ কথা বলিতে লাগিল। মাগীর হাত কি কড়া। আমি মনে করিলাম যে, সাঁড়াশি দিয়া বুঝি আমার কান ছিঁড়িয়া লইতেছে। তার দেখাদেখি, নয় দশ বৎসরের একটা ফচকে ছুঁড়ি ডিঙ্গি দিয়া আমার কান টানিতে লাগিল আর ঐ কথা বলিতে লাগিল। আমার আর সহ্য হইল না। আমি বলিলাম,—"নে নে! তোর আর অত ফচকুমিতে কাজ নাই, আমি তোর পিতেমোর বয়সি।"

কিন্তু এই সময়ে আবার এক বিপত্তি ঘটিল। বরণ-ডালা হস্তে আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী বরণ করিতে আসিলেন। আমার মুখপানে একবার কটাক্ষ করিয়াই তিনি অজ্ঞান! বরণ-ডালা ফেলিয়া, কন্যার হাত ধরিয়া, প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে গিয়া মাটির উপর শুইয়া পড়িলেন। সেই স্থানে শুইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। কান্নার স্বরে তিনি বলিলেন,—"ও গো, মা গো, ও

পোড়া বাঁদরের হাতে তোরে কি করিয়া দিব গো! ও গো মা গো! ও বুড়ো ডেকরার হাতে কি করিয়া তোকে দিব গো! ঘরে যে কালীঘাটের কালীর পট আছে, যা এক পয়সা দিয়া কিনিয়াছিলাম, তার মত তোর যে মুখখানি গো! তুই যে আমার কেলেসোনা গো!" ইত্যাদি। কালীঘাটের পটের মত মুখ বটে! কন্যাকে বাড়ী আনিয়া যখন ভাল করিয়া প্রথম তাঁহার মুখ দেখিলাম, তখন আমার মনে হইল যে, ইনি মানুষ নহেন, কালীঘাটের মা কালীর বাচ্চা।

হুড়তে পুড়তে এই সময় ঘটকী আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ঘটকী বলিল,—"শীঘ্র গহনার বাক্স লইয়া এস।"

কেনা চাকরের নিকট গহনার বাক্স আমি রাখিয়াছিলাম। গহনার বাক্স সে লইয়া আসিল। আমার নিকট হইতে চাবি লইয়া বাক্স খুলিয়া ঘটকী কন্যার গায়ে গহনা পরাইতে বসিল। বাম হাতে তাগা, জসম, তাবিজ, বাজু চুড়ি ও বালা পরাইল। কন্যার কালো গায়ে সোনা ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। শশুড়ী ঠাকুরাণী চক্ষুর জলের ভিতর দিয়া আড়ে আড়ে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার কান্নার স্বর ক্রমে ঢিলে হইয়া আসিল, আমার রূপবর্ণনাও কিঞ্চিৎ শিথিল হইল। এখন তিনি বলিলেন,—"ওগো মা গো! কালীঘাটের কালী ঠাকুরের মত তোর যে মুখখানি গো!" এবার এই পর্যন্ত হইল।

যখন অপর হস্তে সমুদয় গহনা পরানো হইল, তখন তিনি বলিলেন,—"ওগো মা গো! কালীঘাটের কালী ঠাকুরের মত—।" এবার এই পর্য্যন্ত হইল।

যখন গলার গহনা পরানো হইল, তখন চক্ষু মুছিয়া একবার ভাল করিয়া দেখিলেন। তাহার পর কান্নার সুরে বলিলেন,—"ওগো মা গো! কালী-ঘাটের—।" এবার এই পর্যন্ত।

এইরূপে ক্রমেই কান্নার স্বর মৃদু ও ছন্দ পাপড়িভাঙ্গা হইয়া আসিল। অবশেষে কন্যা যখন সমুদয় ভূষণে ভূষিত হইল, তখন তিনি উঠিয়া বসিলেন, দুইবার চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,—"তা হউক! আমার এলোকেশী সুখে থাকিবে।"

শুভদিনে শুভক্ষণে আমার বিবাহ হইয়া গেল। পরদিন কন্যা লইয়া আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কি—সেই তাড়কা রাক্ষসীর বোল সকলে যেন লুফিয়া লইল। সেই দিন হইতে সকলে আমার স্ত্রীর নাম রাখিল "পিত্তি-রক্ষে।" কেবল স্ত্রীর কেন? আমি একটু বুঝিয়া-

সুঝিয়া খরচপত্র করি বলিয়া কেহ আমার নাম করে না। আড়ালে সকলে আমাকেও "পিত্তি-রক্ষে" বলে। আমার গৃহিণী ঘোষেদের গঙ্গায় স্নান করিতে যাইতেন। ছোঁড়ারা তাঁহাকে "পিত্তি-রক্ষে" বলে ক্ষেপাইত। সে জন্য এখন ভোরে ভোরে তিনি বসুদের গঙ্গায় স্নান করেন। কিন্তু যাই বল আর যাই কও, আমাদের কাটী গঙ্গার যেমন মাহাত্ম্য, তেমন আর কোন গঙ্গার নয়; হরিদ্বার, প্রয়াগ, বৃন্দাবনের গঙ্গা কোথায় লাগে!

সন্ন্যাসী আমার কত টাকা নষ্ট করিয়াছিল? সে কথায় এখন আর প্রয়োজন কি? কিন্তু চিরকাল আমি কপালে-পুরুষ, আমার সৌভাগ্যক্রমে এই সময় স্বদেশী হিড়িকটি পড়িল। আমি এক স্বদেশী কোম্পানী খুলিলাম। পূর্বদেশের এক ছোকরাকে চারিদিকে বক্তৃতা করিতে পাঠাইলাম। তাহার বক্তৃতার ধমকে শত শত গরীব কেরাণী স্ত্রীর গহনা বেচিয়া সেয়ার কিনিল; শত শত দীনদরিদ্র লোকও ঘটি-বাটি বেচিয়া আমার নিকট টাকা পাঠাইল। তারপর—এঁঃ—এঁঃ—এঁঃ—এঁঃ—গলায় কিরূপ কফ বসিয়াছে। লম্বোদর বলিলেন,—"কফ কাশীতে আবশ্যক কি? স্পষ্ট বল না কেন যে, সমুদয় টাকাগুলি তুমি হাম করিয়াছ। তাহার পর, দেশসুদ্ধ লোক এখন মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে।"

ডমরুধর বলিলেন,—"ভাগ্যবান্ পুরুষদিগের টাকা একদিক দিয়া যায়, অন্যদিক্ দিয়া আসে। যাহা হউক, মা দুর্গা আমাকে সেই সন্ন্যাসি-সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই অবধি প্রতি বৎসর আমি মা দশভুজার পূজা করি।"

পুরোহিত বলিলেন,—

"যদি বাপি বরো দেয়স্ত্বয়াস্মাকং মহেশ্বরি।
সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথায় পরমাপদঃ॥

দেবগণ বলিলেন,—"হে মহেশ্বরি! যদি আমাদিগকে বর দিবে, তবে ঘোর বিপদে পড়িয়া তোমাকে স্মরণ করিলে, তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিও।"

সমাপ্ত

মন্তব্য। "পিত্তিরক্ষে" বলিয়াছেন যে—"পাঠকদিগের যদি আমার গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। সে বাঘছাল আমার ঘরে আছে। আমি তাঁহাদিগকে দেখাইব। তাঁহাদের সন্দেহ দূর হইবে।"

সম্পাদকীয়

এ সংখ্যা প্রকাশে বেশ একটু দেরী হয়ে গেল। সম্পাদকের দীর্ঘ অসুস্থতা ছাড়াও সময়মত ভাল লেখা না পাওয়াও দেরীর অন্যতম প্রধান কারণ। বিভাব মূলত প্রবন্ধকেন্দ্রিক কাগজ। যথাসময়ে যোগ্য লেখাটি, বিশেষত প্রবন্ধ, পাওয়া ক্রমশই দুরূহ হয়ে উঠছে। এই কারণেই মাঝে মাঝে আমাদের যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশ করতে হয়। এই সংখ্যাও যুগ্ম সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হল। বিলম্বের জন্য অসংখ্য পাঠক ও গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত যে চিঠি পাই তাতে এই কাগজের প্রতি তাদের অকৃত্রিম অনুরাগই প্রকাশিত হয়। সত্যিই ঠিক সময়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী লেখা সংগ্রহ কিছুতেই করে উঠতে পারছিনা। তবে আশা করছি আগামী শারদীয় সংখ্যা থেকে কাগজ নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

গতবারের মতো "বিভাব বিশেষ দিলীপকুমার গুপ্ত পুরস্কার" সংখ্যা আলাদা ভাবে পুস্তিকার আকারে প্রকাশ না করে বিশেষ ক্রোড়পত্র হিসাবে সাধারণ সংখ্যার সঙ্গে প্রকাশিত হ'লো। গতবারের শিশির মঞ্চের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাদের বিনামূল্যে পুস্তিকাটি বিতরণ করা হয়েছিল। মুদ্রণব্যয়ে ও কাগজের দাম ক্রমশই এত ঊর্ধ্বমুখী যে এবার বিনামূল্যে তা সম্ভব হচ্ছে না।

আমাদের খুবই ইচ্ছা করে প্রতিবছরে লিটিল ম্যাগাজিনের এই বিশেষ পুরস্কার বিতরণী সভায় বাংলাদেশের অসংখ্য লিটিল ম্যাগাজিনের সম্পাদক, প্রকাশকদের আমন্ত্রণ জানাই। কিন্তু বাস্তব কারণে কিছুতেই তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। প্রথমত শিশির মঞ্চের আসনসংখ্যা সীমিত (মাত্র চারশ আসন সংখ্যা), দ্বিতীয়ত যে আর্থিক সামর্থ্য থাকলে রবীন্দ্রসদন বা অধিক আসন-সংখ্যার প্রেক্ষাগৃহে এই ধরণের অনুষ্ঠান করা সম্ভব হতো তা আমাদের নেই, অদূরভবিষ্যতেও হবে বলে মনে করিনা। সুতরাং যাদের আমন্ত্রণ জানাতে পারিনি তাদের কাছে আমরা করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তবে ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে লিটিল ম্যাগাজিনের পরিচালকদের আমন্ত্রণ জানাবার।

এবার পুরস্কার সম্পর্কে একটি নিবেদন। এই পুরস্কার 'বিভাব' পত্রিকার তরফ থেকে দেওয়া হলেও সম্পূর্ণ পৃথক একটি নির্বাচক-মণ্ডলী পুরস্কারের যোগ্য লিটিল ম্যাগাজিনটি নির্বাচন করেন। প্রত্যেক বছরে এই নির্বাচক মণ্ডলীর কিঞ্চিৎ রদবদল ঘটে। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে নির্বাচক-মণ্ডলী তাদের পছন্দমত নির্বাচন করেন বছরের শ্রেষ্ঠ লিটিল ম্যাগাজিনটিকে। আর্থিক দায়িত্ব নেওয়া ছাড়া বিভাব কোনভাবেই এই নির্বাচনে নিজস্ব চিন্তা আরোপ করে না।

এ বছর রবীন্দ্রপুরস্কার পেয়েছেন আমাদের প্রিয় কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মূলত মানবতাবাদী এই কবি বিভাবের খুবই কাছের মানুষ। রাজনৈতিক, সামাজিক, এমনকি ব্যক্তিগত হলেও—বিবেকবিরোধী প্রতিটি অন্যায়ে তিনি সোচ্চার। আজীবন কবিতাকেই তিনি অস্ত্রের মতো ব্যবহার করেছেন প্রতিবাদে। এমন বিবেকবান কবির নামের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম যুক্ত হওয়ায় আমরা আনন্দিত।

বিভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধ নিয়ে "বাংলার তিন মনীষী" নামে শ্রদ্ধেয় রাধারমণ মিত্রের যে গ্রন্থটির প্রকাশ সম্প্রতি বিজ্ঞাপিত হয়েছে, অনিবার্য কারণে তার কিছু কিছু অংশ পুণর্মুদ্রণের প্রয়োজন হওয়ায় গ্রন্থটি পাঠকদের পেতে আরো কিছুদিন দেরী হবে। এই তথ্য রাধারমণবাবুই আমাদের জানিয়েছেন।

নানা কারণে এ সংখ্যায় কয়েকটি নিয়মিত বিভাগে কোনো রচনা প্রকাশ করা সম্ভব হ'লো না। আগামী সংখ্যায় যথারীতি প্রকাশিত হবে। বিভাব থেকে সর্বভারতীয় ভাস্কর্যের ওপর সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ (প্রাচীন মন্দির-ভাস্কর্য থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত) যে বিশেষ সংখ্যা ও আকরগ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হবার কথা তার কাজ আরম্ভ হয়েছে। আশা করছি ডিসেম্বরের মধ্যেই তা প্রকাশিত হবে।

শেষ করার আগে সমস্ত লেখক পাঠক বিজ্ঞাপনদাতা ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বিভাবের আগামী সংখ্যাই শারদীয়া সংখ্যা।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

রাতের অনেক সামাজিক অনুষ্ঠান অনেকে দিনেই সেরে ফেলছেন

* এটা ভালই। অনাবশ্যক আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? বিয়ে বাড়িতে যেমন আলোকসজ্জা। যৌতুকের চাপে কনের বাপ-মা যখন অস্থির তখন আলোর মালাও বিছের কামড় হয়ে দাঁড়ায়।

* যৌতুক ও পণপ্রথা সামাজিক কলঙ্ক। তাই এর আদান প্রদান চলে চোখের আড়ালে। এই কুপ্রথা আর অনুষঙ্গিক আড়ম্বর বন্ধ করা দরকার। দেহের জন্য রক্ত যেমন অপরিহার্য, সামাজিক প্রগতির জন্য বিদ্যুৎ-ও তেমনি। এই অত্যাবশ্যক বস্তুটির অপচয় করা অন্যায়।

* ১৯৮০-৮১-তে আমরা ১১৮·৫ বিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছিলাম। ১৯৮১-৮২-র উৎপাদন লক্ষ্য ১৩০ বিলিয়ন ইউনিট এখনও অনায়ত্ত।

কুপ্রথাগুলিকে প্রশ্রয় না দেওয়া এবং দেশের উন্নয়নে প্রয়াসী হওয়া সকলের কর্তব্য

বিশদ বিবরণের জন্য নীচের কুপনটি ভরে পাঠিয়ে দিন—

* * *

ডেপুটি ডিরেকটর,
মাস মেলিং ইউনিট,
ডি. এ. ভি. পি.
বি—ব্লক, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ
নিউ দিল্লী—১১০০০১

আমি নতুন বিশ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানতে আগ্রহী। অনুগ্রহ ক'রে এই সম্বন্ধে আমায় বাংলা/ইংরাজী পুস্তিকাটি পাঠিয়ে দিন।

নাম.....
ঠিকানা.....
পিন.....

* * * *

নতুন বিশদফা কর্মসূচী

৮১/৩৮৩/বাংলা/ডি. এ. ভি. পি.

সংবাদপত্র সমাজদর্পণ হয়ে উঠুক

সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সংবাদপত্রের দুশো বছরের গৌরবময় ইতিহাস রচিত হয়েছে। পরাধীন দেশে দেশবরেণ্য সম্পাদক ও সাংবাদিকরা স্বাধীন-চিন্তা, নির্ভিকতা ও দেশপ্রেমের যে ঐতিহ্যসৃষ্টি করেছিলেন তা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাসেরই অঙ্গ। অর্থদণ্ড, প্রচাররহিত, সম্পাদক ও মুদ্রকের কারাদণ্ড, প্রাক-সেন্সরশিপ ইত্যাদি দিয়ে ব্রিটিশ সরকার চেয়েছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে স্তব্ধ করতে। কিন্তু ইতিহাসের নিয়মেই তা সম্ভব হয়নি। বাংলার নবজাগরণের ধারাতেই সংবাদপত্রের আবির্ভাব; আবার সংবাদপত্র চিন্তার স্বাধীনতা, মানবিকতা ও সমাজপ্রগতির জন্যও সংগ্রামকে উৎসাহিত করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের মুক্তির সংগ্রামের রক্ত, ঘাম, অশ্রুর অনেক ইতিহাস প্রতিধ্বনিত হয়েছে সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়।

দেশ আজ স্বাধীন। কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আজ অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। সম্পদশালী শ্রেণীর পক্ষে বৃহৎ সংবাদপত্রের ভূমিকা স্বাধীন দেশের জনগণের অগ্রগতির পথে অচলায়তন সৃষ্টি করেছে। জাতীয় স্বার্থ, জনগণের স্বার্থ এবং জনশিক্ষার দায়িত্বকে অস্বীকার করে তারা কায়েমী স্বার্থের অবক্ষয় ও স্থিতাবস্থাকেই আঁকড়ে থাকতে চাইছে। বৃহৎ সংবাদপত্র এখন সমাজদর্পণের চরিত্র হারিয়ে তারই মালিক গোষ্ঠীর চিন্তাদর্পণে রূপান্তরিত হয়েছে। অপরদিকে, যারা জনগণের কণ্ঠস্বরকে সোচ্চার করতে চাইছে তারা আক্রান্ত হচ্ছে বারবার। দেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক আবিষ্কারের ওপর যতবার ভয়ংকর আঘাত এসেছে ততবারই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। এই বিপদ ও আশংকার কালো মেঘ মাথার ওপর এখনও ঘনায়মান।

আমরা বিশ্বাস করি, জীবন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেই এবং সংবাদপত্র প্রতিফলিত করবে জনগণের চিন্তাস্রোতকে। আজ যখন বিচ্ছিন্নতা ও স্বৈরতন্ত্রের আস্ফালন জাতীয় সংহতি ও গণতন্ত্রকে বিপন্ন করছে, যখন জাতীয় অর্থনীতিকে সাম্রাজ্যবাদী মহাজনের কাছে বন্ধক দেওয়া হচ্ছে, জনজীবনকে দারিদ্র্য অশিক্ষা আর অবক্ষয়ের অবসাদ যখন আচ্ছন্ন করছে, তখন সংবাদ-পত্রের দুশো বছর পূর্তিতে আমাদের শপথ হোক্—জনগণের প্রকৃত মুক্তির পথকে সত্যের আলোয় আলোকিত করা।

আই. সি. এ. ১৯৩৬

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

BIVAV
Special combined issue
Price Rs. 5.00 January-March '82 Regd. No.
Vol. 5 No. 4 April-June '82 R.N. 30017/76

কৃষি শিল্প শিক্ষা সংস্কৃতির
যাবতীয় কল্যাণকামী প্রকল্পের দ্বারা
নতুন এক সুন্দর ত্রিপুরা গড়ার জন্য
চার বছর প্রয়োজনের তুলনায়
কম হলেও
শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে
বামফ্রন্ট সরকার এক দৃঢ় লক্ষ্যে
অগ্রসর হচ্ছে।

ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী মানুষ
এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন।
এখন এই অগ্রগতির জন্য
সবচেয়ে বড় প্রয়োজন
জাতি ধর্ম ভাষা বর্ণ নির্বিশেষে
শান্তি মৈত্রী ও গণতন্ত্র রক্ষায়
সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস।

তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন বিভাগ ॥ ত্রিপুরা সরকার